সাহিত্য পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যের সকল বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর জন্য
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত বাংলা সাহিত্য।
২৪-১২-৭৬ তারিখের নোটিফিকেশন নং TB/76/7/TB/84 দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য পরিচয়

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

সুশীল বসু, এম. এ.
সম্পাদিত

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রকাশক :
নিতাই বল
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর—১৯৭৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী—১৯৭৭
তৃতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর—১৯৮০
চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৮৩

মূল্য : পাঁচ টাকা আঠাশ পয়সা মাত্র।

মুদ্রাকর
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭

গদ্যাংশ ও পদ্যাংশ সম্বলিত একটি পাঠ্য গ্রন্থ থাকিবে।

সপ্তম শ্রেণী

প্রথম ভাষা

একটি পত্র—পূর্ণ সংখ্যা ১০০
(লেখ্য বিষয় ৯০+মৌখিক ১০)

১। পাঠ্য গ্রন্থ	(ক) গদ্যাংশ	২০
	(খ) পদ্যাংশ	২০
২। ব্যাকরণ		২০
৩। প্রবন্ধ এবং পত্র রচনা বা গল্প লিখন		২০
৪। সহায়ক পাঠ		১০
৫। মৌখিক		১০
		১০০

গদ্যাংশের জন্য ৫০ পৃষ্ঠা আর পদ্যাংশের জন্য ৩০ পৃষ্ঠা মোট ৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ হইবে। গদ্যাংশের মধ্যে থাকিবে (ক) নানান সাহিত্যিক বিষয়—প্রাকৃতিক দৃশ্য, গল্প, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি, (খ) স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বিষয় (দেশীয় কৃষি, শিল্প-বাণিজ্যাদি ও জাতীয় গৌরব বিষয়ক রচনা), (গ) জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবন-বৃত্তান্ত ও সংগ্রামের কথা (সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুখ্যতঃ উনবিংশ শতক হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়ের কথা), (ঘ) মহৎ-জীবন কথা (সর্বভারতীয় মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্ত), (ঙ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অভিযান এবং (চ) একটি নাট্যাংশ।

পদ্যাংশের জন্য প্রসিদ্ধ কবিগণের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা সংকলন করিতে হইবে।

গদ্যাংশে সাধু ও চলিত উভয় রীতির রচনা থাকা আবশ্যক। প্রসিদ্ধ লেখকবর্গের রচনা সংকলিত হইবে। সংকলকের নিজস্ব রচনাও থাকিতে পারে। বিস্তৃত অনুশীলনী থাকিবে এবং অনুশীলনী ও চিত্রাদির জন্য অতিরিক্ত ৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যোগ করা চলিবে। গ্রন্থের আকার ২২"×৩২" ($\frac{১}{১৬}$) টাইপ পাইকা। ২৪ এম্।

সূচীপত্র

॥ গদ্যাংশ ॥

॥ পদ্যাংশ ॥

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি :** অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যার হুগলা জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবন ভাগলপুরে অতিবাহিত হয়। তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি রেঙ্গুন গিয়া একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন। এখান হইতেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী' পদক দিয়া সম্মানিত করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র পরলোক গমন করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'দত্তা', 'বিরাজ বৌ', 'পল্লীসমাজ', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থ শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অবদান। তাঁহার রচিত গল্পের মধ্যে 'মহেশ' গল্প হইতে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচ্য অংশটি গৃহীত। একটি গরুর প্রতি দরিদ্র চাষীর গভীর মমত্ববোধ এখানে পরিস্ফুট হইয়াছে।]

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু তার দাপটে প্রজারা টু শব্দটি করিতে পারে না এমনি প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি-পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটি ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নেই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে দিগন্ত জোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধোঁয়া

হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী।

পথের ধারে একটা পিটলি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিলেন, 'ওরে ও গফ্‌রা, বলি ঘরে আছিস ?"

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ—ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্ছে কি শুনি ? এটা হিন্দুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, খেয়াল আছে। সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখ্‌ছি তেমনি বাঁধা। গো-হত্যা হ'লে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।"

"কি করব বাবা ঠাকুর, বড় লাচারে প'ড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায় জ্বর, দড়ি ধরে যে দু'খুঁটো খাইয়ে আনব, তা' মাথা ঘুরে পড়ে যাই।"

"তবে ছেড়ে দে না আপনিই চরাই করে আসুক।"

"কোথায় ছাড়বো, বাবা ঠাকুর ? লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি—খামারে প'ড়ে, খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আল্‌গুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও একমুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যামনে ছাড়ি বাবাঠাকুর। তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, 'না ছাড়িস তো ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দু'আটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনা ? ফ্যান দেনা এক গামলা, খাক্।"

গফুর জবাব দিল না ! নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন' "তাও নেই বুঝি ? কি করলি খড় ? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ ? গোরুটার জন্যেও এক আটি ফেলে রাখতে নেই ? বেটা কসাই।"

এই নিঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্ রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে সে ধীরে ধীরে কহিল, "কাহনখানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া ব'লে কর্তা মশায় সব ধ'রে রাখলেন। কেঁদে-কেটে হাতে পায়ে পড়ে বললাম বাবু মশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্ব ছেড়ে আর পালাব কোথায়, আমাকে পণ দশেক বিচুলি না হয় দাও। চালে খড় নেই, একখানি ঘর বাপ বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গাঁজা গোঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ ম'রে যাবে।"

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, 'ইস্! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাচিনে।

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল 'কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস দুয়ের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারের গাদা হয়ে গেল ও আমার কুটোটি পেল না।" বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রু ভারে ভারী হয়ে উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন "আচ্ছা মানুষ তা তুই—খেয়ে রেখেছিস্ দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস্—ছোট লোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস।"

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, "নিন্দে করবো কেন বাবা ঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি না। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল ত? বিঘে

চারেক জমি ভাগে চাষ করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠেই শুকিয়ে গেল,—বাপ-বেটীতে দু'বেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পাইনে। ঘরের পাশে চেয়ে দেখ, বৃষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে এক কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটি বার তাকিয়ে দেখ, পাঁজরা গোনা যাচ্ছে—দাওনা ঠাকুর মশাই কাহন দুই ধার, গোরুটাকে দু'দিন পেটপুরে খেতে দিই—তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—একটি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু এ আমার অবোলা জীব—কথা ব'লতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।"

তর্করত্ন কহিলেন, 'ধার নিবি, শুধবি কি ক'রে শুনি ?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল "যেমন ক'রে পারি শুধব বাবা ঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।"

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, "ফাঁকি দেব না! যেমন ক'রে পারি শুধব! রসিক নাগর! যা যা সর, পথ ছাড়। ঘরে যাই বেলা হ'য়ে গেল।"—এই বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিয়া পা বাড়াইয়া সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন—"আ মর ষাঁড়টা শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে নাকি ?"

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। বামুন ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, "গন্ধ পেয়েছে, এক মুঠো খেতে চায়" "খেতে চায় ? তা' বটে। যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই। নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিং! কোন দিন দেখছি কাকে খুন ক'রবে।" এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সে দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দু'টি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা। সে কহিল—"তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক্‌গে।" তাহার
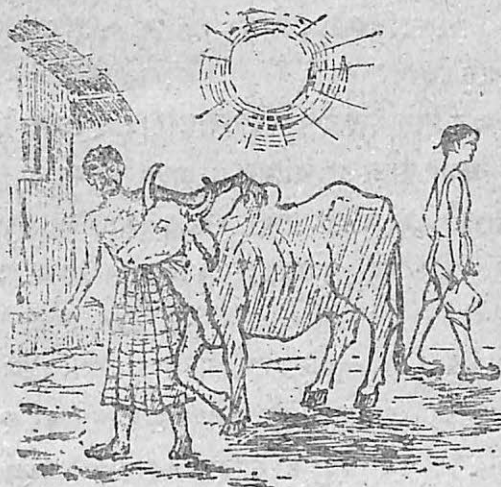
তর্করত্ন মহাশয় হন হন করে চলে যাচ্ছেন

গলা বুজিয়া আসিল, তারপর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল—

"মহেশ, তু আমাদের ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন ক'রে বুড়ো হয়েছিস্। তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু তুই ত জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।"

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গোরুটার পিঠের উপর রগ্‌ড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, "জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে

নিয়ে, শ্মশান-ধারে গাঁয়ে যে গো-চরটুকু ছিল, তাও পয়সার লোভে জমা বিলি করে দিলে! এই দুর্বছরে তোকে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখি, বল। ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, লোকের কলাগাছে মুখ দিবি, তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গোহাটায় বেচে ফেলতে।"

কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই তাহার দু'চোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। গফুর একবার এদিক-ওদিক চাহিল, তারপর ভাঙ্গা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল—

"নে শীগ্‌গীর ক'রে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরী হ'লে আবার—"

"বাবা ভাত খাবে এসো,—এই বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ, বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল; লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরানো পচা খড়, মা, আপনি ঝরে যাচ্ছিল—"

"আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার কোরছ?" "না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—"

"কিন্তু দেওয়ালটা যে প'ড়ে যাবে, বাবা—"

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটি মাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গেছে এবং এমন ধারা করলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ, এই ভাবেই বা কটা দিন চলে?

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এস, বাবা, আমি বেড়ে

দিয়েছি।" গফুর কহিল, "ফ্যানটুকু দেত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।"

"ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে!"

"নেই!" বলিয়া গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না, এই দশ-বারো বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুয়ে সে ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল।

একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া নিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানা মাটির সানকিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে কহিল—"আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা—জ্বর-গায়ে খাওয়া কি ভালো?"

আমিনা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, "কিন্তু তখন যে বললে বড় ক্ষিধে পেয়েছে!"

"তখন? তখন ত জ্বর ছিল, না, মা!"

"তা হ'লে তুলে রেখে দি, সাঁজের বেলায় খেয়ো?"

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে।"

আমিনা কহিল, "তবে?"

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল—

"এক কাজ কর না মা, মহেশকে না হয় ধ'রে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলায় আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে, আমিনা?"

প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "পারবো বাবা।"

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতার ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

[সংক্ষেপিত]

॥ প্রশ্নাবলী ॥

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। 'মহেশ' গল্পটিতে লেখক যে গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার নাম কি? এই গ্রামের গ্রীষ্মের রূপ তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। 'সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গো হত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে।' এ কথাগুলি কে কাহাকে বলিতেছেন। বক্তা কোথায় গিয়াছিলেন এবং কেন গিয়াছিলেন? এখানে 'কর্তা' বলিতে কাহাকে বুঝান হইতেছে? 'গো হত্যা' বলিতেই বা কোন্ গরুটির কথা হইতেছে?

৩। "মহেশ, তুই আমাদের ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস। তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে,—কিন্তু তুই ত জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।"—মহেশ কে? এই প্রসঙ্গে গফুরের জীবপ্রীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর:

(ক) সম্মুখে দিগন্তজোড়া মাঠখানা জলিয়া পুড়িয়া বুককাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে।

(খ) পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

৫। অর্থ লিখ: অন্তরীক্ষ, সমস্যা, সক্রোধ, আশান্বিত, করুণা।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : নরম, ঠাণ্ডা, শীত।

৭। বাক্য গঠন কর : লাচার, চরাই, বাক-রোধ, বিদ্রূপ, বিষ্টি-বাদল, অবোলা, স্তব্ধ, বেদনা, লজ্জিত, নীরব, উদ্বিগ্ন।

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

॥ সাহিত্য পাঠ ॥

২। "কি করবো বাবাঠাকুর, বড় লাচারে প'ড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দু-খুঁটো খাইয়ে আনব,—তা' মাথা ঘুরে পড়ে যাই।"

"তবে ছেড়ে দে না, আপনিই চরাই করে আসুক।"

"কোথায় ছাড়ব বাবাঠাকুর? লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি—খামারে পড়ে, এখনও গাদা দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও একমুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যামনে ছাড়ি বাবাঠাকুর?"

উপরের প্রবন্ধাংশটুকু চলিত ভাষায় রচিত। খুব সতর্কতার সঙ্গে উচ্চারণের দিকে বিশেষ নজর রাখিয়া, বিশেষ বিশেষ বিরাম চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ কর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিবনাথ শাস্ত্রী

[**লেখক পরিচিতি ঃ** ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি চব্বিশপরগণা জেলার চিংড়িপোতা গ্রামে শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম. এ. পাশ করিয়া 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। ছাত্র জীবন হইতে তাঁহার জীবনে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী অন্যতম ছিলেন। ইহার রচিত 'আত্মচরিত' এবং রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ দুইখানা উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাসে অমূল্য উপাদান।]

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ সালে, মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কোনও পারিবারিক বিবাদে উত্যক্ত হইয়া স্বীয় পত্নী দুর্গাদেবীকে পরিত্যাগপূর্বক কিছুকালের জন্য দেশান্তরী হইয়া গিয়াছিলেন। দুর্গাদেবী নিরাশ্রয় হইয়া বীরসিংহ গ্রামে স্বীয় পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস সেই সময় হইতে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিয়া জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন পনর বৎসর হইবে, তখন জননীর দুঃখ নিবারণার্থ অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতাতে আগমন করেন। গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহাদের প্রথম সন্তান।

বিদ্যাসাগর শৈশবে কিয়ৎকাল গ্রাম্য-পাঠশালায় পড়িয়া পিতার সহিত কলিকাতাতে আসেন। কলিকাতাতে আসিয়া তাঁহার পিতার মনিব বড়বাজারের ভগবৎচরণ সিংহের ভবনে পিতার সহিত বাস করিতে আরম্ভ করেন। পিতাপুত্রে রন্ধন করিয়া খাইতেন। অতি কষ্টে দিন যাইত। এই সময় ভগবৎচরণ সিংহের কনিষ্ঠা কন্যা রাইমণি তাঁহাকে পুত্রাধিক যত্ন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোনও দিন সে উপকার বিস্মৃত হয় নাই। বৃদ্ধ বয়সেও রাইমণির কথা বলিতে বলিতে দর দর ধারে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত।

কলিকাতাতে আসিয়া কয়েকমাস পড়িবার পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজে ভর্তি করিয়া দেন। কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষক ও ছাত্র সকলের গোচর হইল। ১৮২৯ সালের জুন মাসে তিনি ভর্তি হইলেন, ছয় মাসের মধ্যেই মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃত্তি সহায় করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কালেজের সমুদয় উচ্চ বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করিলেন।

১৮৪১ সালে তিনি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পাইয়া ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী লিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সকলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু তিনি ইংরাজীতে কিরূপ অভিজ্ঞ, কি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, তাহা অনেকেই জানেন না; এমন কি তাঁহার হাতের ইংরাজী লেখাটিও এমন সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংরাজওয়ালাদের হাতের লেখাও তেমন সুন্দর নয়। এ সমুদয় তিনি নিজ চেষ্টা যত্নে করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মোন্নতি-

সাধনের ইচ্ছা এরূপ প্রবল ছিল যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধব সকলেরই মনে ঐ ইচ্ছা সংক্রামিত হইয়াছিল।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের এসিস্টেণ্ট সেক্রেটারীর পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদ পাইলেন। কিন্তু উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে দুই এক বৎসরের মধ্যে ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের আরম্ভে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কেরাণিগিরির কর্ম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করাতে, মার্শাল সাহেবের অনুরোধে, মাসিক আশি টাকা বেতনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে পদে তাঁহাকে অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। ঐ সালেই তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের কর্ম পাইয়া চলিয়া যাওয়াতে সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যপকের পদ শূন্য হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেথুনের পরামর্শে ঐ পদ গ্রহণ করিলেন। সেই পদ হইতে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন।

অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নানা প্রকার সংস্কার কার্যে হস্তার্পণ করেন। সংস্কৃত কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এই সকল পরিবর্তন সংঘটন করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা এখন কল্পনা করিতে পারি না।

ইহার পর দিন দিন তাঁহার পদবৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ১৮৪৭ সালে তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। 'বেতাল' বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিল। তৎপরে ১৮৪৮ সালে 'বাঙ্গলার ইতিহাস', ১৮৫০ সালে

'জীবনচরিত,' ১৮৫১ সালে 'বোধোদয়' ও 'উপক্রমণিকা', ১৮৫৫ সালে 'শকুন্তলা' ও 'বিধবা বিষয়ক-প্রস্তাব' প্রকাশিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের নিকট পরিচিত হইল।

শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টারের পদ সৃষ্টি হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদের উপরে নদীয়া, হুগলী, বৰ্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের ইন্‌স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। একদিকে যখন তাঁহার পদ ও শ্রম বাড়িল, তখন অপরদিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেই সালেই বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সমাজ সংস্কারে এই তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ নয়। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব যখন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনিও তাঁহার বন্ধু মদনমোহন তর্কলঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন কার্যে আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন।

১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই বৎসর তাঁহার কার্যপটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল।

১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্যতঃ বিধবা-বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, মহিলাগোষ্ঠীতে এই কথা চলিল

শান্তিপুরের তাঁতীরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—এই গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরও হাত দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল।

এই সময় শিক্ষালাভের নব-নিযুক্ত ডিরেক্টার মিস্টার গর্ডন ইয়ংয়ের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ বাঁধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় জেলায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন লইয়া ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলায় স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালক-দিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইয়ং সাহেব, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গভর্নমেণ্টের অর্থ ব্যয় করিতে অস্বীকৃত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিলে স্বাক্ষর করিলেন না। কথায় কথায় মতভেদ ও বিবাদ হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষের বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিবাদের মীমাংসা না হওয়ায় ১৮৫৮ সালে তাঁহাকে কর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়।

আমার বেশ-মনে আছে, তিনি যখন ডিরেক্টারের সহিত ঝগড়া করিয়া কালেজ ছাড়িলেন, তখন আমরা গভর্ণমেণ্টের উপর মহা চটিয়া গিয়াছিলাম। তিনি যেন আমাদের প্রাণ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

আমি গভর্ণমেণ্টের চাকুরী যখন ছাড়িলাম, তখন একজন গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মশাই পাজিটা এমন সুখের চাকুরীটা ছেড়ে দিয়েছে।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "কোন্ পাজির কথা বলছ? সে তো আমার মনের মতন কাজ করেছে।"

কেহ তাঁহার নিকট গিয়া আমাকে গালাগালি করিলে তিনি

আমার ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু বলিতেন, "যাই বল, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।"

আমি নানাস্থলে নানা অবস্থাতে তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার প্রকৃতির গুণসকল দেখিবার যথেষ্ট অবসর পাইতাম। এরূপ দয়াবান, মহাশয়, তেজীয়ান, উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি।

সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বারো টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময়ে অর্দ্ধাশনে থাকিতেন, তিনি একসময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গ সমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে ঠক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমন ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

সাধারণ প্রশ্ন

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের একটি চিত্র অঙ্কন কর।

৩। বিদ্যাসাগরের সহিত শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিষ্টার গর্ডনের বিবাদের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৪। ১৮৫৬ সালকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল বলিবার কারণ বিশ্লেষণ কর।

৫। শান্তিপুরের তাঁতিরা "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" এই—গানাঙ্কিত কাপড় বাহির করিল—তাঁতীরা এই জাতীয় কাপড় কেন এবং কিজন্য বাহির করিয়াছিল?

৬। "মশাই, পাজিটা এমন সুখের চাকুরীটা ছাড়িয়া দিয়াছে"—এখানে 'পাজি' বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে ? তাহার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কি ধারণা ছিল ?

৭। "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটিজুতাসুদ্ধ পায়ে ঠক করিয়া লাথি না মারিতে পারি।"—এ কাহার উক্তি ? তাঁহার চরিত্র আলোচনা কর।

৮। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) তাঁহার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা এরূপ প্রবল ছিল, তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে ঐ ইচ্ছা সংক্রামিত হইয়াছিল।

(খ) এরূপ দয়াবান মহাশয়, তেজীয়ান, উগ্র উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি।

৯। বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে পরিবর্তন কর : দারিদ্র্য, শৈশব, কোমল, উপকার, পুরস্কার, সুন্দর, দুঃখ, বিস্মিত।

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : অর্থোপার্জন, পুত্রাধিক, আত্মোন্নতি, হস্তার্পণ।

॥ মৌখিক প্রশ্ন ॥

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় এবং কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন ?

২। তাঁহার পিতামাতার নাম ?

৩। বিদ্যাসাগর মহাশয় কি ইংরাজী জানিতেন ?

৪। বিদ্যাসাগর কোন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ?

৫। বিদ্যাসাগরের কোন্ বন্ধু বিধবা বিবাহ করেন ?

৬। 'ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না'—ওকে বলিতে বিদ্যাসাগর কাহার কথা বলিতেছেন ?

৭। বিদ্যাসাগর কি কি পুস্তক লিখিয়াছিলেন ?

[illegible] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী আলোচিত ২৫.৮.৮২ ।

ডাক

সুভাষচন্দ্র বসু

[**লেখক-পরিচিতি ঃ** নেতা সুভাষচন্দ্র বসু, সংক্ষেপে নেতাজী। সুভাষচন্দ্র ছিলেন ধনীর সন্তান। আই. সি. এস পরীক্ষায় পাস করিয়াও ইংরেজের দাসত্বে ধরা দেন নাই। তিনি কংগ্রেসকর্মী হইয়া দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ সময় ইংরেজের কারাগারে অতিবাহিত হইয়াছে। দেশবন্ধুর পরলোকগমনের পর তিনি হইলেন চরমপন্থী। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দেশের গণ আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও ত্বরিতগতি করিয়া ইংরাজ শাসনে এক চরম আঘাত হানিবেন। এই সংগ্রামে সহিংস বিপ্লবীদের সাহায্য লইতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের দান অপরিসীম। তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন শান্তি ও শৌর্যের বাণী, মহাত্মার অহিংস মন্ত্রের পাশে এক বিপুল রণতূর্য-ধ্বনি। আলোচ্য নিবন্ধটি দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এক অভয়বাণী।]

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা সেইখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্যজীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্বতোমুখী।

জীবনের সকলক্ষেত্রে সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্মনীতি,—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে মুক্তির সংগীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের প্রধান সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না করিয়াছি—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স জার্মানী, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান—যে কোন দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অঙ্গুলিসংকেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপ তাজমহল যেমন নির্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া, সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, যুগে যুগে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করাল মূর্তি ধারণ করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম

চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন ও শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন—এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়েছে, তরুণ সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল তোমরা ওঠো জাগে উষার কিরণ যে দেখা দিয়েছে।

প্রশ্নাবলী

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। সুভাষচন্দ্র কাহাদের উদ্দেশ্যে ডাক দিতেছেন? এই প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ কর।

২। 'আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি'—এই উক্তি কে করিয়াছেন? 'আমরা' বলিতে কাহাদের বুঝান হইয়াছে? 'মুক্তির ইতিহাস' বলিতে লেখক কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য।

(খ) আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণ সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

৪। অর্থ লিখ : প্রলয়, কণ্টকশূন্য, অবলীলাক্রমে, বিড়ম্বনা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেমাশ্রুরূপী।

৫। বিশেষ্য হইতে বিশেষণ এবং বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে পরিণত কর। সংকীর্ণতা, অর্জন, সমাজ, উচ্ছ্বাস, উদারতা, বিদ্রোহ, নির্মাণ, ধর্ম, তরুণ, বার্ধক্য।

৬। বিপরীত শব্দ লিখ : মুক্তি, শান্তি, সত্য, স্বাধীনতা, যৌবন, জাগরিত, নির্মাণ, ক্রন্দন, জন্ম।

৭। বাক্য রচনা কর : শান্তির জল, অবলীলাক্রমে, মৌলিক, উপনীত, উদারতা।

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

(সাহিত্য পাঠ-বিষয়ক)

১। নিম্নের অংশটিতে অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ, কমা, ড্যাস প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া এবং স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া তোমরা পর পর পাঠ কর :

"এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ? তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে, সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিম রাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন—এটা যেমন সর্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বার্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণ সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠ, জাগো, উষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে।"

অন্নসমস্যায় বাঙালী

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

[**লেখক-পরিচিতি ঃ** অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডন হইতে ডি. এস্-সি উপাধি লাভ করিয়া কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্ববরেণ্য রসায়নশাস্ত্রবিদ—ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের জনক। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কেবল বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুলেখক ও কর্মযোগী। সরল জীবনযাপনের এক আদর্শ প্রতিমূর্তি। বেকার বাঙালী যুবকদের কর্মসংস্থানের সমস্যা, বাঙালী সমাজের আত্ম-সংস্থানের চিন্তা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল—তাই তিনি চাকুরির নেশায় মত্ত তরুণ বাঙালী সন্তানের কর্ণে 'আত্মনির্ভর', 'আত্মপ্রত্যয়' ও 'আত্মপ্রচেষ্টা'—এই অভয় মন্ত্র দিয়াছেন। 'ফাঁকি দিয়া কাজ করিলে শুধু ফাঁকে পড়া আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না'—ইহাই হইল আচার্য রায়ের সাবধান বাণী। 'বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার,' 'অন্নসমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' প্রভৃতি গ্রন্থ আচার্যদেবের স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।]

মহামতি গোখ্‌লে একদিন বাঙালীর ললাটে গৌরব টীকা দিয়া বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে বাঙালীই নব নব চিন্তার প্রবর্তক।" বাস্তবিক একদিন ছিল যখন বাঙালী কি ভাবে, বাঙালী কি বলে, বাঙালীর চিন্তা কি নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছে, এই সব জানিবার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক বাঙালীর দিকে সাগ্রহে চাহিয়া থাকিত; কিন্তু সে গৌরব বাঙালী আজ হারাইতে বসিয়াছে। যে ছিল সকলের অগ্রগামী, সে আজ জীবনের নানাবিধ ক্ষেত্রে সকলের পশ্চাতে পড়িয়াছে। ডিগ্রীপ্রিয়, চাকরিপ্রিয়, বাঙালী বিলাসের আরাম শয্যায়, আলস্যের নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

আজ বড় দুঃখে তাহার ঘুম ভাঙ্গিতেছে। বুদ্ধির অহংকারে অন্ধ হইয়া সে জীবন সংগ্রামে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে,—তাই আজ প্রকৃতির এই নির্মম প্রতিশোধ !

প্রথম বয়সে যৌবনের প্রারম্ভে, বাঙালীর ছেলে যখন কলেজে প্রবেশ করে, তখন তার আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত মুখখানি দেখিয়াছি। কিন্তু কলেজের পড়া শেষ করিয়া যখন জীবন সংগ্রাম আরম্ভ করে, তখন সেই আশার আলো বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।

এই দুঃখ দূর করিবার ভার বাঙালী যুবককে আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। জীবন সংগ্রামের একটি প্রধান দিক লক্ষ্য করিলেই বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালী সকল দিকের সকল ক্ষেত্র হইতে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছে।

দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙালী একরূপ সুখে ছিল। গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, ঘরে ঘরে চরকা—বাঙালীর অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না। তখন বাঙালী ছিল বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। জীবন-সংগ্রামের কঠিন প্রতিযোগিতার প্রবল আঘাত তখন বাঙালীর গায়ে লাগে নাই। তাহার পর অবস্থার পরিবর্তন হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী আপন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা পরিবর্তিত করিতে পারিল না। সেই যে পরাজয় আরম্ভ হইল, আজও সেই পরাজয়ের পালা চলিতেছে।

দেশে রেলপথ বিস্তৃত হইল, বড় বড় কলকারখানা স্থাপিত হইল। বাঙালী কৃষকের দেহের রক্ত জল করিয়া উৎপন্ন করা ফসলে বিদেশী বণিক প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া সম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিল, আর বাঙালী অবাক-বিস্ময়ে আপন শোচনীয় অধঃপতনকে বিধিলিপি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, মুখটি বুজিয়া, হাতটি গুটাইয়া চুপ

করিয়া রহিল! তাহার পর অন্নপূর্ণার দেশে হইল অন্নাভাব। কোন রকমে আধপেটা খাইয়া আজ আমরা জীবনধারণ করিতেছি। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে কোনমতে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেছি না, আর আমাদের দুর্গতির জন্য সকল দোষ আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া বলিতেছি—"ইংরাজ এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির ধনধান্য লুটিয়া লইয়া যাইতেছে।"

দিল্লীওয়ালা ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে করতলগত করিতেছে, —আর আমরা তাহাদের হিসাব লিখিয়া মাস মাহিনা লইয়া আসিতে পরমানন্দে কলম পিষিতেছি।

কেরানীর তো এই দশা! বাঙালী শ্রমজীবীর দৃশ্যও কিন্তু ভাল নয়। জুতা ব্যবসায়ী প্রায় সবই চীনা; এক-আধ জন ভারতীয় অবাঙালী। আবার কলিকাতায় ও মফঃস্বলের শহরে ছুতার একেবারে জাত-ব্যবসা ত্যাগ করিতেছে। বাঙালী ছুতার আজ প্রায় নিরন্ন। চীনা ছুতারের অনেক গুণ তাঁহারা ফাঁকি দেয় না,—তাহাদের উপর কাজের ভার দিয়া ভরসা পাওয়া যায়, দৃষ্টির আড়াল করিলে তাহারা হাত গুটাইয়া ফাঁকির আসর জমায় না! চীনাদের মজুরি বেশী, কিন্তু 'সস্তার তিন অবস্থা' দেখিয়া লোকে বেশী মজুরি দিয়াও তাহাদিগকে কাজ দেয়; তাহারা সমবেত হইয়া কাজ করিয়া আপন আপন অবস্থার উন্নতি করিতেছে। বাঙালী ঝগড়া করিতে জানে, সমবেত হইতে জানে না—কাজেই হটিয়া যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কলিকাতার সব কাঠের গোলার মালিক ছিল বাঙালী; এখন চীনা মিস্ত্রী অধিকাংশ কাঠের গোলার মালিক হইয়াছে আর তাহাদের সাবেক মনিবগণ সেই সব গোলায় কেরানীর কাজ করিতেছে। এই অশিক্ষিত চীনারা এদেশে আসিয়া আমাদের মুখের অন্ন গ্রাস করিতেছে। আর আমরা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ধ্যানস্থ

হইয়া আছি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অন্য জাতি প্রবেশ-লাভ ও সব অধিকার হরণ করিয়া লইতেছে, আর আমরা তিল তিল করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি! এইরূপ আলস্য ও শ্রম-বিমুখতা আমাদের সকল দুর্গতির কারণ। শ্রমের মর্যাদা-জ্ঞান আমাদের আদৌ নাই বলিলেই চলে।

আমাদের যুবকেরা ডিগ্রী ও চাকরির মোহ ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে এ দুর্দশার অন্ত নাই! শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি ব্যবসায় ও শ্রমের মর্যাদা বুঝেন এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে একত্র সম্মিলিত হইয়া দাঁড়াইতে শিখেন, তবে তাহাদের, উদাহরণ দেখিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল গুণের আদর করিতে শিখিবে। তাহাদের বিলাসের বীজ আজ সমাজের নিম্নস্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে;—চাষী আজ মিহি কাপড় খুজে, মোটা কাপড় আর পরিতে পারে না। তাহার কারণ, সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা শৌখীন ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। জাতীয় চরিত্রের এই দোষত্রুটি সংশোধিত না হইলে আমাদের অন্নসমস্যা দূর হইবার কোন আশা নাই।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীরাও অতি সামান্য কার্য হইতে ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছেন। কার্নেগী প্রথমে ছিলেন তার অফিসের সংবাদবাহক, পরে ব্যবসায় হইতে তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার কারবার ক্রয় করিবার জন্য নববই কোটি টাকা মূলধনের একটা সঙ্ঘ গড়িতে হইয়াছিল। 'ব্যবসায়ের সাম্রাজ্য নামক একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুস্তকের এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—"ব্যবসায় শিক্ষা করিতে হইলে অফিস ঝাঁট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে।" শিক্ষাভিমানী, বিলাসপ্রিয় বাঙালী যুবককে একথা বলিলে তাহার শৌখীন প্রাণটি আঘাতে শিহরিয়া উঠিবে।

শিক্ষার্থীকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। হীনতা স্বীকার করিয়া, সর্ব প্রকার সহ্য করিয়া, কৃতিত্ব অর্জনের প্রয়াস আমাদের যুবকগণের মধ্যে দেখা যায় না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আমাদের যুবকগণ একমাস বা দেড়মাস সকল দিকে একবার তাড়াতাড়ি দৃষ্টিপাত করিয়া বলেন, 'সব শিখে নিয়েছি— এইবার টেবিল, চেয়ার ও বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া দিয়ে আমাকে একটা বিভাগের কর্তা করে দিন। এই ধৈর্যহীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সকলেই কল্পনা করিতে পারেন।

আমরা দোকান করিয়া 'ফেল মারি।' কেউ কাহারও অংশীদার হইয়া ব্যবসায় করিতে জানি না, এরূপ ব্যবসা আরম্ভ করিলেই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করি। আর তিনমাস অসুখ হইলে বা অন্য কোন কারণে চক্ষুর আড়ালে থাকিলে, অংশীদারকে দিব্য ফাঁকি দিয়া ফেলি, ধর্মবুদ্ধি, ন্যায়বুদ্ধি তখন রসাতলে অদৃশ্য হইয়া যায়। আর বাস্তবিক্ আমরা যে বুদ্ধির বড়াই করি, সে কেবল পাস করা বুদ্ধি, তাহার মধ্যে প্রীতি, উদারতা, আত্মবিশ্বাস কিছু নাই। সে কেমন একটা বিশ্রী ধার, যাহা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারে, কিন্তু যুক্ত করিয়া গড়িতে পারে না।

ভারতে যাহারা রাজ্য গঠন করিয়াছেন, সেই আকবর, শিবাজী, হায়দর আলী, রণজিৎ—কেহই পুঁথিগত বিদ্যার ধার ধারিতেন না। প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি-কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত আছে। মন্ত্রীদের সাহায্যে আকবর সেনাবিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতির কি অদ্ভুত সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা সর্বজনবিদিত ও সর্বত্র প্রশংসিত।

বই না পড়িয়াও যে আত্মোন্নতি সম্ভব, তাহা অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, ভুপালের বেগম প্রভৃতির জীবন কথা হইতে জানা যায়।

আজ বাঙালীর পরাজয় পদে পদে। বাঙালী কেন পারে না? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—বাঙালী অধ্যবসায়হীন, বাঙালীর মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা নাই, শিক্ষাপ্রণালীরও কোন স্থানে একটা মস্ত বড় গলদ রহিয়া গিয়াছে। পাঠ্যাবস্থায় বাঙালী ছাত্র যাহা শেখে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশগুণ শিক্ষা করা উচিত। পরীক্ষায় কাজে লাগিবে না, অতএব পড়িব না, এ একটা ভয়ানক ব্যাধি। জ্ঞানার্জন হউক, বা না হউক শুধু পাশ করিতে পারিলেই হইল। মুখস্থ কণ্ঠস্থ করিয়া পাশ করিবার বিস্তৃত আয়োজনে সর্বতোভাবে বুদ্ধির বিকাশ হইবার অবসর হয় না। কার্যক্ষেত্রে পাশ করা বুদ্ধি প্রায়ই 'অকেজো' হইয়া দাঁড়ায়। ফাঁকি দিয়া কাজ করিলে শুধু ফাঁকে পড়া ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে?

॥ প্রশ্নাবলী ॥

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। 'বাঙালীর অন্ন-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তব্য বিষয়টি তোমার নিজের কথায় বিবৃত কর।

২। "বুদ্ধির অহংকারে অন্ধ হইয়া সে জীবন সংগ্রামে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে—তাই আজ প্রকৃতির এই নির্মম প্রতিশোধ।"—এখানে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া লেখক এই কথা বলিতেছেন? জীবন সংগ্রামে সে কি ফাঁকি দিল? প্রকৃতি কি ভাবে প্রতিশোধ নিয়াছে আলোচনা কর।

৩। 'তখন বাঙালী ছিল বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য; জীবন সংগ্রামের কঠিন প্রতিযোগিতার প্রবল আঘাত তখন বাঙালীর গায়ে লাগে নাই।" লেখক কোন সময়ের কথা বলিতেছেন? আলোচ্য অংশটি হইতে তৎকালীন বাঙলার ও বাঙালীর যে পরিচয় পাও তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। "অন্নপূর্ণার দেশে হইল অন্নাভাব—"অন্নপূর্ণা কে? তাঁহার দেশ কোনটি? সেখানে অন্নাভাবের কারণ কি?

৫। 'এই ধৈর্যহীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সকলেই কল্পনা করিতে পারেন।"—কোন্ 'ধৈর্যহীনতার' কথা বলা হইয়াছে? আলোচনা কর।

৬। "আজ বাঙালীর পরাজয় পদে পদে"—এই পরাজয়ের কারণ কি? কি ভাবে ইহার প্রতিকার আশা করা যায়?

৭। "ফাঁকি দিয়া পাশ করিলে শুধু ফাঁকে পড়া ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে?"—'অন্নসমস্যায় বাঙালী' নিবন্ধটি অবলম্বনে লেখকের এই উক্তির যথার্থ বিশ্লেষণ কর।

৮। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর:

(ক) যে ছিল সকলের অগ্রগামী, সে আজ জীবনের নানাবিধ ক্ষেত্রে সকলের পশ্চাতে পড়িয়াছে।

(খ) বুদ্ধির অহংকারে অন্ধ হইয়া সে জীবন সংগ্রামে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে,—তাই আজ প্রকৃতির এই নির্মম প্রতিশোধ।

(গ) সেই যে পরাজয় আরম্ভ হইল, আজও সেই পরাজয়ের পালা চলিতেছে।

(ঘ) আলস্য ও শ্রমবিমুখতা আমাদের সকল দুর্গতির কারণ। শ্রমের মর্যাদা আমাদের নাই বলিলেই চলে।

(ঙ) আমরা যে বুদ্ধির লড়াই করি, সে কেবল পাস-করা বুদ্ধি—তাহার মধ্যে প্রীতি, উদারতা, আত্মবিশ্বাস কিছুই নাই; সে কেমন একটা বিশ্রী ধার, যাহা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারে, কিন্তু যুক্ত করিয়া গড়িতে পারে না।

(চ) ফাঁকি দিয়া কাজ করিলে শুধু ফাঁকে-পড়া ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে?

৯। শব্দার্থ লিখ: অগ্রগামী, উদ্দীপ্ত, বিধিলিপি, পারিপার্শ্বিক, সামঞ্জস্য, অবশ্যম্ভাবী, আত্মবিশ্বাস, সর্বজনবিদিত।

১০। বাক্য রচনা কর: সুখের স্বপ্ন, আশার আলো, রক্ত জল করিয়া মোটা কাপড়, কীর্তি কথা, সস্তার তিন অবস্থা।

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

সাহিত্য পাঠ

নিম্নের অংশটি স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া পাঠ কর। অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ, কমা প্রভৃতি বিরাম-চিহ্নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

'দেশে রেলপথ বিস্তৃত হইল, বড় বড় কল কারখানা স্থাপিত হইল, বাঙালী কৃষকের দেহের রক্ত জল করিয়া উৎপন্ন করা ফসলে বিদেশী বণিক প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া সম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিল, আর বাঙালী অবাক বিস্ময়ে আপন শোচনীয় অধঃপতনকে বিধিলিপি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া মুখটি বুজিয়া, হাতটি গুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর অন্নপূর্ণার দেশে হইল অন্নাভাব। কোন রকমে আধপেটা খাইয়া আজ আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। না, আর আমাদের দুর্গতির জন্য সকল দোষ আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া বলিতেছি, ইংরাজ এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে প্রাধান্য লুটিয়া লইয়া যাইতেছে।

লণ্ডনের পথে

অন্নদাশংকর রায়

[**লেখক-পরিচিতি ঃ** আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। তাঁহার মনোজ্ঞ ভাবগর্ভ এবং পরিহাস মধুর রচনাই তাঁহাকে এই বিশিষ্ট স্থানের অধিকার দান করিয়াছে। অন্নদাশংকর কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রথিতযশা আই. সি. এস। কঠোর রাজকার্যের অনুশাসন তাঁহার সাহিত্য অনুরাগ বা সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি বিন্দুমাত্র আঘাত হানিতে পারে নাই। এখনও তাঁহার লেখনী অপ্রতিহত। ইহার প্রথম রচনা 'পথে প্রবাসে' ইওরোপের ভ্রমণবৃত্তান্ত মূলক গ্রন্থ। আলোচ্য নিবন্ধটি অন্নদাশংকরের 'পথে প্রবাসে' গ্রন্থের অংশমাত্র।]

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম। মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোস্পদের মতো দেখাতো সে-ই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরব সাগর, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হয়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার করে দিতে চলেছে।

জাহাজ টল্‌তে টল্‌তে চলল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্র পীড়ায় প্রথম তিনদিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারু সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের

খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ করতে আপত্তি না করলেও উদর তা রক্ষণ করতে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে প'ড়ে প'ড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউবা ভাবে মরতে আর দেরী নেই। সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'—মাথার যন্ত্রণায় 'লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ ক'রে পড়ে থাকতে, প'ড়ে প'ড়ে আকাশ পাতাল ভাবতে।

সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সংকল্প ক'রে ফেল্লেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পারবেন না। তাঁকে
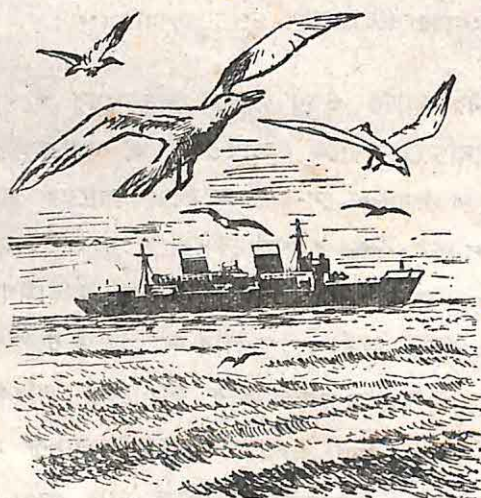
জাহাজ থেকে মহাসমুদ্রের দৃশ্য

স্মরণ করে দেওয়া হলো এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উটের পিটে চড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার

যখন উপায় নেই তখন ফির্‌তে হবে সেই সমুদ্র পথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক করে ফেল্লুম মার্সেল্‌সে নেমে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।

আরব সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়লুম তখন সমুদ্র-পীড়া বাসী হয়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটির ওপর মায়াও প'ড়ে গেছে; তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে, বিদেশকে; কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি না; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে। কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হ'য়ে যায়।

ডেকে চেয়ার ফেলে ব'সে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হ'য়ে যায়; চারিদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ কেবল জাহাজের আশেপাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ-চুম্বনে জলের হৃদয়স্পন্দন। বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশ গল্প করতে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিতসাগরের পারে ভূমধ্যসাগর। দুয়ের মাঝখানে যেন একটা সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া নামে আফ্রিকার হাত ধরে ছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেন নি, লেসেপ্‌স তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েকশত মাইলের ব্যবধান। এইটুকুর জন্য ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে

আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হতো। মিশরের রাজারা কোন্ যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য লোহিতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটাতে গোটা কয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পারে। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হ'তে হ'তে গত শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণে আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসী স্থপতি লেসেপ্স একজন বিশ্বকর্মা; তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে।

সুয়েজ কেনাল আমাদের দেশের কোন ছোট নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এতে বড় জোর দু'খানা জাহাজ পাশাপাশি আসা-যাওয়া করতে পারে, কিন্তু কেনাল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। কেনালটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান-রকমের গাছ যত্ন করে লাগানো, যত্ন ক'রে রক্ষিত, অন্যদিকে ধূ ধূ করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। কেনালের দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যে দিকে মিশর সেই দিকেই বেশি।

কেনালটি যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেরিয়ে আসা গেল। শহরটায় বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসী প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাতের উপর বসে খেতে হয়, রাস্তায় চল্‌বার সময় ডানদিক ধরে চলতে হয়। পোর্ট সৈয়দ হলো নানা জাতের নানা দেশের মোশাফেরদের তীর্থস্থল—

কাজেই যেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলেই একজনের ট্যাঁকের টাকা আর একজনের ট্যাঁকে ওঠে।

পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর স্বাধীন দেশ। ইউরোপের মত কাছে বলে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র বলে মিশরীরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশী মিশতে পেরেছে, তাদের বেশী অনুকরণ করতে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া-আসা করতে পারছে!

পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। অধিকাংশকে মার্সেল্‌সে নামতেই হলো। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেলস পর্যন্ত জল ছাড়া দুইটি দৃশ্য ছাড়া দেখবার আর কিছুই নেই। প্রথমটি ইটালি ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারে পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয় স্ট্রম্বোলী আগ্নেয়গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেলস্‌ ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসীদের দ্বিতীয় বড় শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে, ফরাসীদের বন্দে মাতরম্‌ 'La Marseillaise'-এর এই নগরেই জন্ম। কাব্যে এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসী সহজিয়া কবিদের (Troubadour) প্রিয়ভূমি এই সেই Provence—বসন্ত সেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্বদিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম। সেই সব গ্রামে গ্রীষ্ম যাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। Bandol নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম। মোটরে ক'রে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেলসকে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মত সাতপাকে জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেল্‌স্‌ শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরী। ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আর একটা

রাস্তা সমতল নয়, কোন রাস্তায় ট্রামে করে যেতে ডান দিকে মোড় ফিরলে একেবারে রসাতল, কোন রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে বাঁদিকে বেঁকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেল্‌সের অনেক রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুটপাত।

মার্সেল্‌স থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাট্‌ল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে। ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। লেখক এবং তাঁহার সহযাত্রীগণের সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। এই প্রবন্ধে লেখক সুয়েজ খালের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৩। পোর্ট সৈয়দ শহরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪। প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) সমুদ্র পীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না—সমুদ্র পীড়া কী?

(খ) 'চারিদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশেপাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ চুম্বনে জলের হৃদয়স্পন্দন।'—এই বাক্যগুলি দ্বারা লেখক কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

(গ) 'পোর্ট সৈয়দ থেকে ভূমধ্যসাগরে পড়লাম'—পোর্ট সৈয়দ থেকে ভূমধ্যসাগর কোন্ দিকে অবস্থিত?

৫। টীকা লিখ : (ক) তীর্থের কাক, (খ) রাবণের চিতা।

৬। বিশেষ্য পদকে বিশেষণে এবং বিশেষণ পদকে বিশেষ্যে পরিণত কর : শ্যামলতা, সংকীর্ণ, সমুদ্র, ইতিহাস, আশ্রয়, কলাকুশল, লোভনীয়।

অরণ্যশোভা

বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[**লেখক-পরিচিতি ঃ** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পরচয়িতা। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিভূতিভূষণ তাঁহার মাতুলালয় চব্বিশ পরগণা জেলায় মুরাতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিয়া হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত। তাঁহার প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' এই সময় প্রকাশিত হয়। অতঃপর তিনি শিক্ষকতা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জমিদারী এস্টেটের কর্মভার গ্রহণ করেন। এই কর্ম ব্যাপদেশে তাঁহাকে ভাগলপুরের নিকটবর্তী দেরা-ইসলামপুর যাইতে হয়। এখানকার অরণ্যপ্রকৃতি তাঁহার সাহিত্য জীবনের উপর প্রভূত রেখাপাত করে। আলোচ্য নিবন্ধটি তাঁহার 'আরণ্যক' কল্পনার সুষ্ঠ প্রকাশ। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটশিলায় হঠাৎ তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।]

দিক চক্রবালে দীর্ঘ নীল রেখার মতো পরিদৃশ্যমান পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় মনের মধ্যে কত স্বপ্ন আনে! সমস্ত অরণ্যভূমি আমার কাছে পরীর বেশ বলিয়া মনে হয়। ইহার জ্যোৎস্না, ইহার নির্জনতা, ইহার নীরব রহস্য, ইহার সৌন্দর্য, পাখির ডাক, ফুলের শোভা সবই মনে হয় অদ্ভুত ; মনে এক অপূর্ব শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়।

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া আমি ও সুজন সিং বাহির হইলাম। ন'মাইল ঘোড়ায় গিয়া, দুই দিকের দুই শৈলশ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি শৈলসানু বনে ভরা। পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বন ঝোপের মধ্য দিয়া সরু পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে। বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়; কিন্তু অজস্র বন্য শেফালি বৃক্ষ বনের সর্বত্র ফুলের খই ছড়াইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে পথটার দু'ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু'দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘন সন্নিবিষ্ট কালো গাছের গুঁড়ি তাহাদের তলায় নানা জাতীয় ফার্ণ। চাহিয়া দেখিলাম, পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া ক্রমশ উঠিতেছে, বন আরও কৃষ্ণায়মান। সামনে উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া! অপূর্ব গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূরে উঠিলাম, পথটা আবার নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে। কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়াল তলায় ঘোড়া বাঁধিয়া আমরা শিলাখণ্ডে বসিলাম—উদ্দেশ্য শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাহাদের মাথায় শরতের ঘন নীল আকাশ কত কাল হইতে এই বন-পাহাড় এক রকমই আছে। সুদূর অতীতে আর্যেরা 'খাইবার' গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখন

এই রকমই ছিল। বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়া যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিটিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রিতে চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত। তমসা-তীরের পর্ণ কুটিরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন . সূর্য অস্তাচল চূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্ত মেঘ স্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রম মৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে। সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত
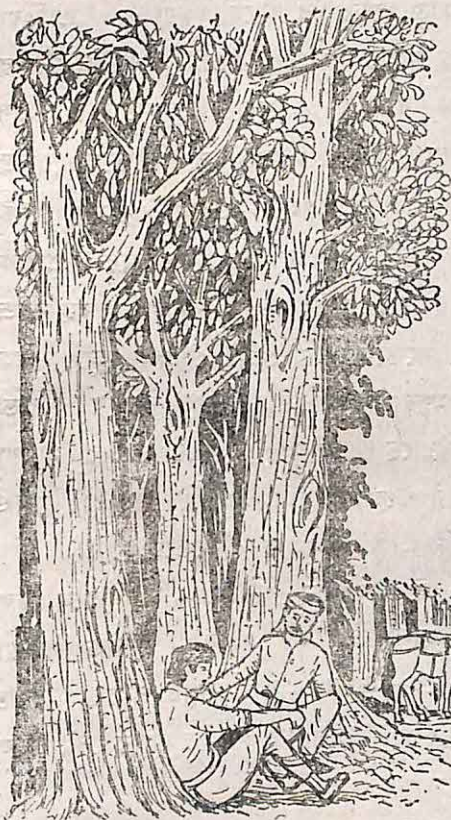
হইয়াছিল—আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ম্বর-সভায় পৃথীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন, সামুগড়ের

যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে-রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পালাইলেন, যে দিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—ঐ শৈলচূড়া এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে ? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে, মহুয়া বীজ ভাঙিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু'খণ্ড কাঠের তৈরী একটা ঢেঁকির মতো কি আছে, আর এক বুড়ীকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স আশি নব্বুই হইবে। শণের নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল। এখানে বসিয়া সেই বুড়ির কথা মনে পড়িল। এই অঞ্চলে বন্য সভ্যতার প্রতীক ঐ প্রাচীনা বৃদ্ধা—উহারই পূর্বপুরুষেরা এই বনজঙ্গলে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যীশুখ্রীষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন সেদিন উহারা মহুয়া-বীজ ভাঙিয়া তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বৎসর মুছিয়া অতীতের ঘন কুজ্মটিকায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, উহারা আজও সেকালের মতো সাতনলি দিয়া পাখি শিকার করিতেছে।

অতীতে কোন দিন এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র। প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত এই বালুকাময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

এই বালুপ্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্তৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরনের গাছপালাও ছিল না ; যে ধরনের গাছপালা জীবজন্তু ছিল,

পাথরের বুকে তাহাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে-কোন মিউজিয়ামে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙা হইয়া আসিয়াছে। শেফালি বনের গন্ধ ভরা বাতাস হেমন্তের হিমের ঈষৎ আমেজ। আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হইবে না, সম্মুখে কৃষ্ণা-একাদশীর রাত্রি। আমরা আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখকের মনের যে গভীর অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

২। নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়া যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিটিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকের মতই হাসিত।"—বুদ্ধদেব কে? তিনি কেন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন?

(খ) শণের নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল'।—এই কথাগুলি কাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে? 'শনের নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতে'—বলিয়া কি বুঝান হইয়াছে?

৩। অর্থ লিখ : দিকচক্রবাল, উপলাস্তৃত, নিস্তব্ধতা, অস্তাচলচূড়াবলম্বী।

৪। বিশেষ্য পদকে বিশেষণে এবং বিশেষণ পদকে বিশেষ্য পদে পরিণত কর : সৌন্দর্য, আনন্দ, পার্বত্য, গভীর, অনুরঞ্জিত, নির্জনতা, নীরব, ঘন।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : প্রাচীন, শান্তি, আনন্দ, নিশ্চিহ্ন।

হলদিঘাটের পরে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[**লেখক-পরিচিতি :** ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার। রসরচনা এবং সংগীত রচনায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। 'শাহজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক এবং 'হাসির গান', 'আষাড়ে' প্রভৃতি কৌতুকে রসাত্মক গীতগ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত রচনা। তাঁহার দেশভক্তিমূলক বহু গান আজিও সমধিক জনপ্রিয়। তিনি ডি. এল. রায় নামেই অধিক পরিচিত। আলোচ্য নাট্যাংশটি তাঁহার 'মেবার পতন' নামক নাটকের নাট্যাংশ মাত্র। প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর অমরসিংহ মেবারের রাণা হন। তিনি প্রথমে দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। আলোচ্য দৃশ্যে তাঁহার সংকল্প পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।]

(স্থান—উদয়পুরের মেবারের রাজসভা। কাল—প্রভাত। সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা অমর সিংহ। তাঁহার উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে তাঁহার সামন্তগণ। গোবিন্দসিংহ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

জয়সিংহ ॥ রাণা! যখন মোঘল সৈন্য মেবারের দ্বারদেশে, তখন মেবারের কর্তব্য কি, সে বিষয়ে রাজপুতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আমরা যুদ্ধ করবো।

রাণা ॥ জয়সিংহ! এই ক্ষুদ্র জনপদ আজ কি সাহসে ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাট মোগল বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াবে?

কেশব ॥ ক্ষত্রিয় শৌর্যের সাহসে রাণা!

কৃষ্ণদাস ॥ কি সাহসে রাণার পিতা স্বর্গীয় প্রতাপসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন ?

রাণা ॥ প্রতাপসিংহ ! তিনি মানুষ ছিলেন না।

শঙ্কর ॥ তিনিও রাজপুত ছিলেন।

রাণা ॥ না শঙ্কর ! তিনি এ জাতির কেহ ছিলেন না। তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈবশক্তির মত।···কোথা থেকে এসেছিলেন, কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানে না। সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হতে পারে না শঙ্কর।

কৃষ্ণদাস ॥ সকলে রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না স্বীকার করি, কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র তাঁর পদানুসরণ করবেন, আশা করা যায়। প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন, আর তাঁর পুত্র বিনা যুদ্ধে মোগলের দাস হবে ?

রাণা ॥ কৃষ্ণদাস, সে একটা সুন্দর অনুভূতিমাত্র ; এই কয় বৎসরে মেবারবাসী ধনী, সুখী, সম্পদশালী হয়েছে। রাজ্যে একটা গভীর শান্তি বিরাজ করছে। শুদ্ধ একটা অনুভূতির খাতিরে এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা হারাবো ? যখন একটা নামমাত্র কর দিলেই এ হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শঙ্কর ॥ কর দিব রাণা ? কাকে ? কে মোগল ? কোথা থেকে এসেছে ? কি স্বত্বে তারা ভগবান রামচন্দ্রের বংশধরের কাছে কর চায় ?

রাণা ॥ শঙ্কর ! সামান্য একটা কর দিয়ে এই সুখশান্তি, স্বচ্ছন্দতা অক্ষুন্ন রাখা শ্রেয়, না—কর না দিয়ে তা হারান ভাল ? তুমি কি বিবেচনা কর গোবিন্দসিংহ ?

গোবিন্দসিংহ ॥ (চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন) আমি কি বিবেচনা করি রাণা ? আমি কিছু বিবেচনা করি না। আমি এ সব

কিছু বুঝি না। সুখ, শান্তি, স্বচ্ছন্দতা কাকে বলে, তা আমি জানি না। আমি শুধু দুঃখ জানি। বাল্যকাল হতে দুঃখের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, বিপদের ক্রোড়ে আমি লালিত। রাণা, আমি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে রাণার স্বর্গীয় পিতা প্রতাপসিংহের সঙ্গে অরণ্যে, প্রান্তরে পর্বতে, অনাহারে, অনিদ্রায় ভ্রমণ করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি সেই মহাত্মার পদতলে ব'সে দারিদ্র্যের ব্রত অভ্যাস করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি দুঃখের পরম সুখ অনুভব করেছি। সে কি সুখ! পরের জন্য দুঃখ ভোগ—কি সে সুখ! কর্তব্যের জন্য দারিদ্র্য ভোগ কি মধুর!—রাণা আমার কি দিনই গিয়েছে।

জয়সিংহ॥ বল গোবিন্দসিংহ। চুপ করলে যে? বল। আবার বল।

গোবিন্দসিংহ॥ কি আর বলবো জয়সিংহ···সব গিয়েছে। আর কি আছে জয়সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষ রশ্মি!

কেশব॥ তুমি জীবিত থাকতে সে গৌরব ম্লান হবে না গোবিন্দসিংহ।

গোবিন্দসিংহ॥ আমি! আমি আজ আর কি করব কেশব রাও? আজ আর আমার সেদিন নাই। আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি,··· তবু এখনও ইচ্ছে করে রাণা যে, সে পর্বত অরণ্যে ছুটে যাই, মায়ের জন্য আবার সেই মধুর দুঃখ ভোগ করি, ভাইয়ের জন্য আবার মনে মনে কেঁদে বেড়াই। ঈশ্বর! দুঃখ সহিবার ক্ষমতাটুকু কেড়ে নিলে!

(গোবিন্দসিংহ নীরব হইলে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে রাণা কহিলেন।)

রাণা॥ কিন্তু গোবিন্দসিংহ সমস্ত আর্যাবর্ত মোগল সম্রাটের কাছে শির নত করেছে। আজ রাজপুতনার মধ্যে এক ক্ষুদ্র মেবার

এই বিপুল বিশ্ববিজয়নী বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কি করবে ? কি বল গোবিন্দসিংহ ?

গোবিন্দ সিংহ ॥ রাণা ! আমার বক্তব্য ছিল, তা বলেছি, আর আমার কিছু বক্তব্য নেই।

রাণা ॥ সামন্তগণ ! আমার বিবেচনায় এ যুদ্ধ নিষ্ফল। আমরা মোগল সেনাপতির সঙ্গে সন্ধি করবো। মোগল দূতকে ডাক দৌবারিক। (দৌবারিকের প্রস্থান)

গোবিন্দসিংহ ॥ রাণা প্রতাপ ! রাণা প্রতাপ ! তুমি স্বর্গ থেকে যেন একথা শুনতে না পাও।···মেবার ! মোগল প্রভুত্ব স্বীকার করবার আগে একটা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাও।

(মোগল দূতের প্রবেশ)

রাণা ॥ মোগল দূত, তোমাদের সেনাপতিকে বল যে, আমরা সন্ধি করতে প্রস্তুত।
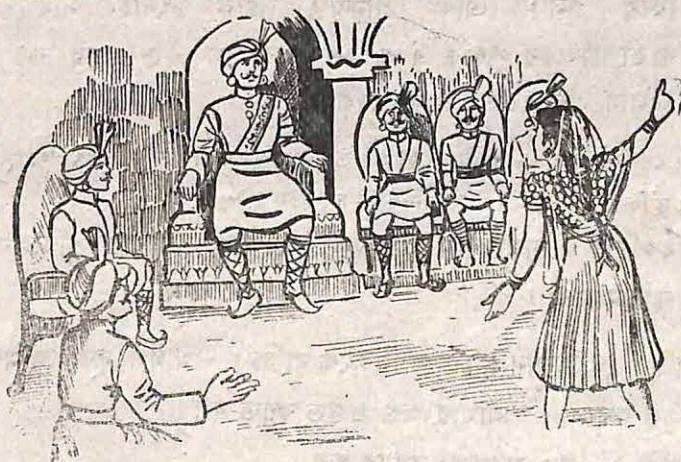
(বেগে সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্যবতী ॥ কখন না। সামন্তগণ তোমরা যুদ্ধের জন্য সাজ। রাণা

যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদের সেনাপতি হবো।

গোবিন্দসিংহ॥ কে তুমি মা। এই ঘনায়মান অন্ধকারে স্থির বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ালে, কে তুমি মা! এ কার মৃদুগম্ভীর বজ্রধ্বনি শুনছি!

রাণা॥ সত্য, কে আপনি?

সত্যবতী॥ আমি একজন চারণী! আমি মেবারের গ্রামে উপত্যকায় তার মহিমা গেয়ে বেড়াই। এর চেয়ে আমার অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

সামন্তগণ॥ আশ্চর্য! রাণা উদয়সাগরের প্রসাদকুঞ্জে শুয়ে বিলাসের স্বপ্ন দেখুন। আমি তোমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব। গোবিন্দসিংহ॥ এ কি! আমার দেহে কি নব যৌবনের তেজ ফিরে এল! একি আনন্দ! একি উৎসাহ সামন্তগণ, প্রতাপসিংহের পুত্রকে এ অপযশ থেকে রক্ষা কর। দূর কর এ বিলাস, ভেঙ্গে ফেল এ সব খেলনা!

(গোবিন্দসিংহ একখানি পিত্তলখণ্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ একখানি বৃহৎ আয়নার উপর ছুঁড়িয়া মারিলেন। আয়নাখানি চূর্ণ হইল।)

গোবিন্দসিংহ॥ সামন্তগণ! অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও, (রাণাকে ধরিলেন) আসুন রাণা।

রাণা॥ গোবিন্দসিংহ! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি!—মোগল দূত, আমরা যুদ্ধ করবো। আমার অশ্ব প্রস্তুত করত বল।

সত্যবতী॥ জয় মেবারের রাণার জয়।

সকলে॥ জয় মেবারের রাণার জয়।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। আলোচ্য নাট্যাংশে গোবিন্দসিংহের চরিত্রের কি চিত্র পাওয়া যায় ?

২। রাণা অমরসিংহ মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন কেন ?

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

॥ সাহিত্য পাঠ ॥

১। নিম্নের নাট্যাংশ হইতে গোবিন্দসিংহের উক্তিটি পাঠ কর :

"আমি কি বিবেচনা করি রাণা ? আমি কিছু বিবেচনা করি না। আমি এসব কিছু বুঝি না। সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দতা কাকে বলে আমি তা জানি না। আমি শুধু দুঃখ জানি। বাল্যকাল হইতে দুঃখের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব, বিপদের ক্রোড়ে আমি লালিত। রাণা আমি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে, রাণার স্বর্গীয় পিতা প্রতাপসিংহের সঙ্গে অরণ্যে, প্রান্তরে, পর্বতে, অনাহারে, অনিদ্রায় ভ্রমণ করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি সেই মহাত্মার পদতলে বসে দারিদ্র্যের ব্রত অভ্যাস করেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি দুঃখের পরম সুখ অনুভব করেছি। কি সে সুখ! পরের জন্য দুঃখ ভোগ—কি সে সুখ! কর্তব্যের জন্য দারিদ্র্য ভোগ কি মধুর! রাণা, আমার কি দিনই গিয়েছে।"

রাণা অমরসিংহ প্রথমে দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, — আলোচ্য দৃশ্যে তার বর্ণনা রয়েছে।

উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু

জগদীশ চন্দ্র বসু

[**লেখক-পরিচিতি :** আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত বংশে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন! ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে বি. এস্-সি. ও ডি. এস্-সি উপাধি লাভ করেন। ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময় তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বহু তথ্য আবিষ্কার করেন। জগদীশচন্দ্র বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের ন্যায় উদ্ভিদ্ এমন কি ধাতব পদার্থেরও প্রাণ আছে। উদ্ভিদবিদ্যা ক্ষেত্রে এই মৌলিক গবেষণার জন্য ইনি বৈজ্ঞানিক জগতে খ্যাতিলাভ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক যাত্রা করেন। আলোচ্য নিবন্ধটি জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে একটি মৌলিক রচনা।]

মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তারপর বর্ষার আরম্ভ। দুই এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, "আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্যের আলো দেখিবে। আস্তে আস্তে বীজের ঢাক্‌নাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ

নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়ভাবে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয়, শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

গাছের অঙ্কুর বাহির হইলে যে অংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে, তাহার নাম মূল। আর এক অংশ উপরের দিকে বাড়িতে থাকে তাহাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেরই 'মূল' আর 'কাণ্ড' এই দুই ভাগ দেখিবে। এই এক আশ্চর্যের কথা; গাছকে যে রূপেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাইবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকদিন ধরিয়া টবটিকে উল্টা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়া রহিল, আর শিকড় উপরের দিকে রহিল। দুই-একদিন পরে দেখিতে পাইলাম যে, গাছ যেন টের পাইয়াছে। তাহার সব ডালগুলি বাঁকা হইয়া উররের দিকে উঠিল ও মূলটি ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গেল। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেকবার মূলা কাটিয়া শয়তা করিয়া থাকিবে। দেখিয়াছ, প্রথমে শয়তার পাতাগুলি ও ফুল নীচের দিকে থাকে। কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যায়, পাতা ও ফুলগুলি উপরের দিকে উঠিয়াছে।

আমরা, যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোট ছোট শিশুদের দাঁত নাই; তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিস গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিস আহার

করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায় ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এই সব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না তখন ঠোঁট দুইটি বুজিয়া যায়! আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাস করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়, তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে, তবে সকল জন্তু অল্প দিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে উহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা কি করিয়া একটু আলো পায়। যদি জানলার কাছে টবে গাছ রাখ তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া, কে আগে আলো পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে; এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাহা সূর্যের তেজ। গাছ ও তাহার শস্য, আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে; গাছে যে সূর্যের তেজ আছে তাহা এই প্রকারে জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পরিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরাও আলো আহার করিয়াই বাঁচিয়া আছি।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। গাছ কিভাবে আহার করে?

২। 'আলোই জীবনের মূল'—প্রমাণের সাহায্যে এই উক্তির সত্যতা বুঝাইয়া দাও।

৩। নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

(ক) 'মনে হয়, শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।' —এই বাক্যাংশের লেখক কে? 'শিশু' বলিতে লেখক কাহাকে বুঝাইতেছেন? নূতন দেশই বা কি?

(খ) 'যাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহা আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়।'—এই জিনিসটি কি?

(গ) 'আমরাও আলো আহার করিয়াই বাঁচিয়া আছি।'—আমরা কিভাবে আলো আহার করি বুঝাইয়া দাও।

জাতীয় আন্দোলনের এক অধ্যায়
জওহরলাল নেহরু

[**কাহিনী পরিচিতি ঃ** স্বনামধন্য সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত জওহরলাল নেহরুর 'আত্মচরিত' হইতে কিয়দংশ এখানে সংকলিত হইয়াছে। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। আলোচ্য অংশে লেখক সেই আন্দোলনের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছেন।]

১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস আসিল। বিদ্যুৎ চমকের মতো আমরা দেশের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাইলাম সর্বত্র বৃহৎ জনতা নিস্তব্ধ, গাম্ভীর্যপূর্ণ, স্বাধীনতার সংকল্পবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, সে এক মহান দৃশ্য। সেখানে কোন বক্তৃতা নাই, অনুরোধ-উপরোধ নাই। এই অনুষ্ঠান হইতে গান্ধীজী প্রেরণা লাভ করিলেন এবং দেশের নাড়ীর গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিলেন, কার্য করার সময় উপস্থিত। রঙ্গমঞ্চে ঘটনার দ্রুত সমাবেশে মহানাট্য জমিয়া উঠিল।

সহসা লবণ শব্দটি অপূর্ব রহস্য ও শক্তিতে মণ্ডিত হইল। লবণ করকে আক্রমণ করিতে হইবে, লবন-আইণ ভঙ্গ করিতে হইবে। আমরা হতভম্ব হইলাম। জাতীয় সংঘর্ষের সহিত অতি সাধারণ লবণের সম্পর্ক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।...পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গান্ধীজীও কি তাহাই বুঝেন, অথবা আমাদের

বলিবার ভাষা স্বতন্ত্র? ঘটনার রথচক্র চলিতে লাগিল তর্ক করার অবসর রহিল না।

তারপর গান্ধীজীর সহিত বড়লাটের পত্র বিনিময় হইল এবং সবরমতি আশ্রম হইতে ডাণ্ডি অভিযান আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন এই তীর্থযাত্রীদের অগ্রসর জনসাধারণ উৎসুক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং দেশব্যাপী উৎসাহনল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আসন্ন আন্দোলন পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আহম্মদাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসিল। আন্দোলনের নেতা অনুপস্থিত, তিনি তীর্থযাত্রীদের লইয়া সমুদ্রতীরে চলিয়াছেন এবং ফিরিয়া আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। সকলে গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনায় সভায় স্থির হইল, কমিটির সকল ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে, তিনি কার্যকরী সমিতির শূন্যপদে অপরকে মনোনীত করিবেন এবং তিনি স্বয়ং গ্রেফতার হইলে পরবর্তী সভাপতি মনোনীত করিয়া যাইবেন, তাঁহারও অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে। প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলিকেও অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল।

এদিকে গান্ধীজী লবণ সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরবর্তী গন্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন। যষ্টিহস্তে সকলের পুরোভাগে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নির্ভীক প্রশান্ত। কী মহিমাময় দৃশ্য!

এপ্রিল আসিল, গান্ধীজী ক্রমশ সমুদ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, আমরা লবণ আইন ভাঙ্গিয়া আইন অমান্যের জন্য আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি।...৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস, সত্যাগ্রহ হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগ—১৯১৯-এর সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়া বাৎসরিক অনুষ্ঠান হইতে থাকে। গান্ধীজী ঐ দিবস ডাণ্ডির

বেলাভূমিতে লবণ আইন ভঙ্গ করিলেন। তিন চারি দিন পরে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্ব স্ব এলাকায় ঐরূপ করিবার নির্দেশ দিয়া আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে বলা হইল।

মনে হইল যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ বন্যার জল আসিয়াছে। দেশের সর্বত্র, প্রতি পল্লী নগরীতে লবণ তৈয়ারীর কথা আলোচিত হইতে লাগিল, এবং লবণ তৈয়ারীর নানারূপ অদ্ভুত উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা এ বিষয়ে অল্পই জানিতাম, পুঁথিপত্র খুঁজিয়া কিছু আবিষ্কার করা গেল। লবণ তৈয়ারীর নিয়ম ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল। আমরা হাঁড়ি-কড়াই সংগ্রহ করিয়া অনেক কষ্টে লবণের মতো এক রকম পদার্থ তৈয়ারী করিলাম। তাহাতেই কত আনন্দ। এবং উহাই উচ্চমূল্যে ফেরি করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল। লবণ ভাল হউক মন্দ হউক, কিছু যায় আসে না, নিন্দনীয় লবণ-আইন ভঙ্গ করাই প্রধান কথা। আমাদের লবণ খারাপ হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। লবণ তৈয়ারী দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। জনসাধারণের উৎসাহের অন্ত রহিল না। গান্ধীজী যখন প্রথম এই প্রস্তাব করেন, তখন তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম বলিয়া লজ্জা ও কুণ্ঠা অনুভব করিলাম। এই মনুষ্যটির জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শৃঙ্খলিতভাবে কার্যে নিয়োগ করিবার কী আশ্চর্য শক্তি, আমরা বিস্মিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ১৪ই এপ্রিল আমি গ্রেফতার হইলাম। ঐ দিনই কারাগারের মধ্যে আমার বিচার হইল, লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য আমি ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম।

প্রতিদিন কি উৎসাহ, কী উত্তেজনা, কত রোমাঞ্চকর সংবাদ মিছিল ও যষ্ঠি প্রহার, গুলিবর্ষণ, বিখ্যাত নেতাদের গ্রেফতারে

হরতাল, তাহার উপর পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়ালী দিবস, প্রভৃতি অনুষ্ঠান। সাময়িক ভাবে বিদেশী বস্ত্র ও সর্ববিধ ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করিল।

এই সময় নারীদের দলে দলে জাতীয় সংঘর্ষে যোগদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহার দলে দলে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাহিরের কাজে অনভ্যস্ত হইলেও তাঁহারা মহোৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশী বস্ত্র ও আবগারি দোকানে পিকেটিং করা তাঁহারা একচেটিয়া করিয়া লইলেন। প্রত্যেক শহরে দলে দলে নারীরা মিছিল করিতে লাগিলেন এবং সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেন।

৫ই মে গান্ধীজী গ্রেফতার হইলেন. পশ্চিম উপকূলে অধিকতর উৎসাহের সহিত লবণগোলা আক্রমণ ও লবণ সংগ্রহের কাজ চলিতে লাগিল। লবণ আইন অমান্যকারীদের উপর এককালে পুলিশ-বর্বরতার কতকগুলি বেদনাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোম্বাই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিল এবং বড়ো বড়ো হরতাল, মিছিল ও লাঠিচালনা চলিতে লাগিল। লাঠির আঘাতে আহতদের চিকিৎসার জন্য কয়েকটি হাসপাতাল স্থাপিত হইল। বোম্বাই বৃহৎ শহর বলিয়া এখানের ঘটনাগুলি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ছোটোখাটো শহর এবং পল্লী অঞ্চলের ঘটনাগুলি মোটেই প্রচারিত হয় নাই।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। 'জাতীয় আন্দোলনের এক অধ্যায়' নিবন্ধটি হইতে ১৯৩০ সালের আন্দোলনের যে চিত্রটি পাওয়া যায় তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। গান্ধীজীর লবণ আইন ভঙ্গের কাহিনী তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

অজানার সন্ধানে

কালিদাস রায়

[**লেখক পরিচিতি ঃ** কালিদাস রায় বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একাধারে শিক্ষক, কবি, সাহিত্য-সমালোচক এবং হাস্যরসিক। তাঁহার পল্লী কবিতাগুলি মধুর এবং অতি সুন্দর চিত্র সংবলিত। 'পর্ণপুট', 'ঋতুমঙ্গল', 'ব্রজরেণু', 'রস কদম্ব', 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' প্রভৃতি তাঁহার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

এক শ্রেণীর জ্ঞানীগুরুগণ গৃহে বা আশ্রমে বসিয়া গ্রন্থশালা কিংবা পরীক্ষাগারে গবেষণা করিয়া অবিরত সাধনার দ্বারা জগতের জ্ঞান-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর এক শ্রেণীর জ্ঞানবীর দূরদূরান্তরে পৃথিবীর অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত পথের পথিক হইয়া জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়া জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। মানুষকে কিছুতেই প্রবেশাধিকার দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিকূল প্রকৃতি যেখানে সহস্র বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল ইহারা সেখানে অবিরত সংগ্রাম করিয়া প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। এই বীরব্রতে কেহ-বা জয়ী হইয়াছেন, কেহ-বা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কেহ-বা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অন্য কোন দুঃসাহসী বীরকে ব্রতভার সমর্পণ করিয়া উদ্‌যাপনের প্রতীক্ষায় অবশিষ্ট দিন যাপন করিয়াছেন। এই দুঃসহ কষ্ট স্বীকার, এই অমানুষিক কৃচ্ছসাধন, এই তিলে তিলে প্রাণোৎসর্গ কিসের জন্য? এই অসাধ্যসাধন সত্যের আবিষ্কারের জন্য; জগতের জ্ঞানসম্পদ বাড়াবার জন্য, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের

জন্য—সর্বোপরি নিয়তির মতো নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে জয় করিয়া মানুষের পৌরুষের গৌরব বৃদ্ধির জন্য।

মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না—মেরুপ্রদেশে, উচ্চতম পর্বতের শিখরদেশে, কোনো কোনো নদীর সূতিকাগারে ও বিষুবমণ্ডলের গভীর অরণ্যানীতে। আজ বীর অভিযাত্রীরা সর্বত্র প্রবেশ করিয়া জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে। এখানে আমি শুধু দুই অভিযাত্রীর উত্তরমেরু অভিযানের কথা বলিব।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমেরিকাসীরা উত্তরমেরু দিয়া সহজে চীনে পৌঁছাইয়া বাণিজ্য চালাইবার আশা পোষণ করিতেন। এই পথ আবিষ্কারের জন্য প্রথম যাত্রা করেন হেনরী হাড্‌সন। তিনি মেরুপ্রদেশে পৌঁছাইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি হিমমণ্ডলের কোন কোন দ্বীপ, প্রণালী, উপসাগর ইত্যাদি আবিষ্কার করেন।

তারপর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ন্যানসেন নামক একজন নরওয়েবাসী নাবিক সাতাশ বৎসর বয়সের সময় সুমেরুর দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে লইলেন শ্লেজগাড়ী, কিছু খাদ্য, পাঁচজন সঙ্গী এবং বরফের উপর দিয়া চলিবার স্কী নামক কাঠের জুতা। এই যাত্রার তিনি গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব-উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূলে পৌঁছিলেন। এই গ্রীনল্যাণ্ড প্রায় আফ্রিকার মতো বিরাট একটি মহাদেশ, কিন্তু সারা বৎসর বরফে আবৃত থাকে বলিয়া সমুদ্রবর্তী অঞ্চলে এস্কিমো ছাড়া অন্য কোন লোকের বাস নাই। উত্তরমেরু পৌঁছিতে না পারিয়া ন্যানসেন গ্রীনল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু তিনি দমিবার পাত্র ছিলেন না। কয়েক বৎসর পরে তিনি পাঁচ বৎসরের মতো খাদ্য এবং বারো জন অনুচরসহ নূতন ধরনের জাহাজে চড়িয়া আবার যাত্রা করিলেন। এই জাহাজ এমন ভাবে তৈরী ছিল যে, উহা বরফের চাপে বা আঘাতে ভাঙ্গে না।

মেরু প্রদেশে প্রবেশ করিয়া বরফের ভাসন্ত পাহাড়ে তাঁহার জাহাজ আটকাইয়া গেল। বরফের পাহাড় ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার জাহাজকেও ঠেলিয়া লইয়া চলিল। এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন জাহাজের গতি বড়ই মন্থর। এইভাবে বরফের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া যাইতে হইলে মেরুতে পৌঁছিতে তাঁহার বহুদিন লাগিবে। তখন তিনি জাহাজ ছাড়িয়া বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া মেরুর দিকে চলিলেন। সঙ্গে থাকিল কিছু খাদ্য, একজন অনুচর,
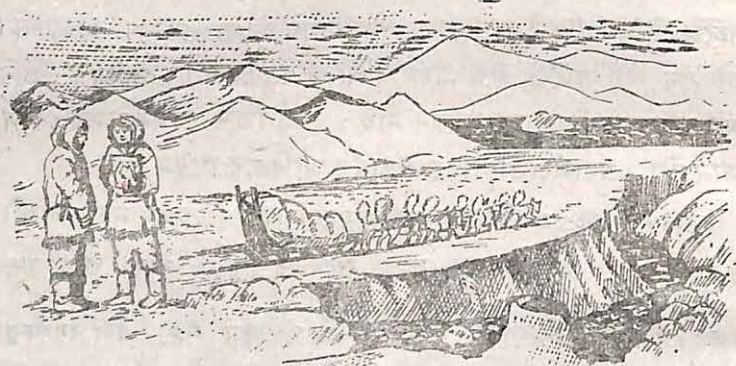
সুমেরু অভিযানে একজন সঙ্গীসহ ন্যানসেন

আঠাশটি তুন্দ্রাভূমির কুকুর, শ্লেজগাড়ী ও এস্কিমোদের তৈয়ারী চামড়ার নৌকা।

এইভাবে বীর ন্যানসেন চলিলেন সুমেরু-বিজয়ে। বরফের উপর দিয়া চলা যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপদসংকুল। মাঝে মাঝে ফাটল আছে, সাবধানে এই ফাটল এড়াইয়া চলিতে হয়। নতুবা একেবারে অতল তলে তুষার সমাধি। যেখানে ফাটল খুব বিস্তৃত সেখানে চামড়ার নৌকার সাহায্যে তিনি পার হইতে লাগিলেন। ক্রমে খাদ্য ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। তখন তাঁহারা দুইজনে

এক একটি কুকুর মারিয়া খাইতে লাগিলেন। কী ভীষণ অমানুষিক সাধনা ভাবিতে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

বীর অভিযাত্রী আপন ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কী কঠোর তপস্যাই না করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন যে ভাবে—তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে মেরুকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে এখনো দুই মাস লাগিবে; অন্তত দুইশত মাইল তখনও বাকী। এদিকে বাকী কুকুরগুলিতে দুই সপ্তাহকাল চলিতে পারে। সম্মুখে অগ্রসর হইলে মরণ সুনিশ্চিত ভাবিয়া ন্যানসেন দুইশত মাইল দূর হইতে জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। দুই বৎসর পরে ন্যানসেন সুমেরু-কেন্দ্রের কাছাকাছি গিয়াছিলেন। তিনিই মেরুমণ্ডলের আকাশের অদ্ভুত আলোক-লীলার কথা দেশে আসিয়া প্রচার করেন। মেরুমণ্ডলের বহু কথা তাঁহার অভিযান হইতে ইওরোপ জানিতে পারে।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। উত্তর মেরু অভিযানের বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা কর।

২। ন্যানসেনের অভিযান কাহিনী বর্ণনা কর।

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) এই বীরব্রতে.........যাপন করিয়াছেন।

(খ) মানুষের প্রবেশাধিকার......জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে।

৪। শব্দার্থ লিখ: জ্ঞানসম্পদ, কৃচ্ছসাধন, বিপৎসংকুল, দুঃসাধ্যসাধন।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত, জ্ঞান, আবৃত, অগ্রসর, মরণ, অনাহার, আশ্রয়।

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর: প্রাণোৎসর্গ, আবিষ্কার, সর্বোপরি, সর্বাঙ্গ, সূর্যোদয়।

৭। বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণে এবং বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত কর: দুঃখ, আনন্দ, কঠিন, আশ্রয়, আবিষ্কার, সাবধান।

শৈশব স্মৃতি

বিপিন চন্দ্র পাল

লেখক পরিচিতি ঃ বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা রামচন্দ্র পাল মুনসেফ ছিলেন। বিপিনচন্দ্র অতি অল্প বয়সে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে পড়িবার সময় ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে কটকের এক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে বিপিনচন্দ্র দেশের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া ইনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ইনি অসাধারণ বাগ্মিতার দ্বারা দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনায় ইনি বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩১ সালের ২০শে মে এই মনীষী পরলোক গমন করেন।]

শৈশবের শ্রীহট্ট জেলা ভদ্রাসন বাড়িতে জন্মালেও আমার বাল্য-স্মৃতি শৈশবের নহে, ঢাকার সঙ্গে জড়িত। বাবা সে সময় ঢাকায় কর্ম করিতেন, তখনও তিনি সদর আলার পেশকারই ছিলেন কিনা ঠিক জানি না। বোধ হয় আমার জন্মের বৎসর কিংবা তাহার পূর্ব বৎসর ওকালতি পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়। সদর আলার দপ্তরে পেশকারি করিবার সময়েই বাবা ঐ পরীক্ষা দেন। ঢাকা হইতে যাঁহারা সেবারে ওকালতি পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই উত্তরপত্র কলিকাতার পথে ডাকের গোলমালে হারাইয়া যায়। পরীক্ষকেরা এইজন্য তাঁহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়াই সকলকে ওকালতির

সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সনন্দের জোরে বাবা পেশকারি ছাড়িয়া ঢাকাতেই ওকালতি আরম্ভ করেন।

ঢাকা হইতেই বাবা মুনসেফ হইয়া প্রথমে যশোহরে কোন মহকুমায় যান। এখানে বেশীদিন ছিলেন না; সেজন্য মা তাঁহার সঙ্গে যশোহরে যান নাই। যশোহর হইতে বদলী হইয়া বরিশালের অন্তর্গত কোর্টের হাট মহকুমায় যান। এখানে বোধ হয় তিন চার বৎসর ছিলেন। কোর্টের হাটে আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কোর্টের হাটের কথা আমার খুব পরিষ্কার মনে আছে।

কোর্টে হাটের মহকুমা অনেকদিন উঠিয়া গিয়াছে। নলচিটির নিকটে এখনও কোর্টের হাটের বাজার আছে। তিন চারি বৎসর পূর্বে ঝালকাটি গিয়াছিলাম। সেখান হইতে নিকটবর্তী দু-তিনটা গ্রামেও যাইতে হয়। এ সময় এক ভদ্রলোকের মুখে বাবার স্বাক্ষর করা একটা দলিল তাঁদের বাড়ীতে আছে শুনিয়াছিলাম। এইরূপ দুই-একটা পুরাতন দলিলেই কোর্টের হাটে যে একটা মুনসেফি আদালত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনও সাভ-ডিভিসনের সৃষ্টি হয় নাই। মুনসেফরাই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। আজকালিকার দিনে সাবডিভিসনাল অফিসারদের যে পদ ও মর্যাদা ষাট বৎসর পূর্বে বাংলার মুনসেফদের সেই পদ ও মর্যাদা ছিল।

কোর্টের হাটের নীচে একটা খাল ছিল। সেখানে প্রায়ই কুমীরের উপদ্রব হইত। তাহার চারিদিকে জঙ্গল ছিল। সে জঙ্গলে প্রায়ই বাঘ দেখা যাইত। এমন কি রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে বাঘের ডাক শুনিতে পাইতাম। আমাদের বাসার নিকটেই একটা পুকুর ছিল। জোয়ারের সময় সেই পুকুরের তীর ছাপাইয়া উঠিত কখনও কখনও আমাদের উঠান পর্যন্ত ভাসাইয়া দিত। সেই জোয়ারের জল দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইত

তাহা আজিও ভুলি নাই। জোয়ারের জলের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে পুঁটি, মকা, কলিকাতার মৌরালা, বেলে প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ সফরে বাহির হইত। এ সকল দৃশ্য আমার অন্তরে নানা প্রকার কৌতূহল জাগাইয়া দিত। আমি কবি নহি. কিন্তু সকল মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু কবি কল্পনার বীজ লুকাইয়া থাকে। কোর্টের হাটের জোয়ার ভাটার খেলা আমার মধ্যে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল। জল প্লাবন আজিও আমার চিত্তকে মাতাইয়া তোলে।

একবার পূজার সময় বাবা যাইবার মতন ছুটি পান নাই। আমাদের বাড়ীতে পূজা হইত। আমি বাড়ী যাইবার জন্য বায়না ধরিলাম। বাবা, আমার কান্না থামাইবার জন্য কোর্টের হাটের নিকটবর্তী গ্রামে যাঁহাদের বাড়িতে পূজা হইত তাহাদিগকে মহকুমায় আনিয়া প্রতিমা বিসর্জন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেবার বিজয়ার দিনে কাছারির সামনের মাঠে একটি বড় মেলা হইয়াছিল। এখনও সে ছবি চক্ষে ভাসিতেছে।

তাঁহার বিচারে লোকে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ না করিতে পারে, বাবা সে বিষয়ে অতি সাবধান ছিলেন। এক দিনের কথা মনে পড়ে। আমার বয়স তখন বছর চারেক হইবে। বাবা দু'বেলা আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পাতে বসাইয়া খাওয়াইতেন। একদিন প্রাতে আমরা খাইতে বসিয়াছি, মা, কলমি শাক পরিবেশন করিলেন। বোধ হয় ইতিপূর্বে বাবা কোর্টের হাটে কলমি শাক খান নাই। এ শাক কোথা হইতে পাইলেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, এক পাটুনি বুড়ী দিয়া গিয়াছে। দাম দিয়াছ? বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন। 'কলমি শাকের আবার দাম কি?' সে ও দাম চায় নাই, আমিও দিই নাই"—মা একথা কহিলেন। বাবা অমনি

ভাতের থালা ঠেলিয়া দিয়ে উঠিয়া গেলেন। বাইরে যাইয়া পেয়াদা পাঠাইয়া সেই পাটুনি বুড়ীকে ডাকাইয়া তাহার শাকের দাম দিয়া, আর সে যেন কখনও আমাদের বাসার নিকটে না আসে, আসিলে বিশেষ শাস্তি পাইবে এইরূপ সাবধান করিয়া দিলেন।

এই সামান্য কলমি শাকের জন্য বাবা এতটা বিচলিত হইয়াছিলেন কেন? ইহার বিশেষ কারণ ছিল। মাও পরে সে কথা শুনিয়াছিলেন। মার মুখে আমি শুনিয়াছি। এই পাটুনী বুড়ীর এক অতি অকর্মণ্য পুত্র ছিল। সে মাঝে মাঝে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইত। এইজন্য তাহার মা হাকিমের বাড়ী যাতায়াত করে, বাবা কিছুতেই ইহা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

ঘুমন্ত শিশুর দুই পাশে দুইটি গোসাপ

কোর্টের হাটের আর একটি স্মৃতি পয়ষট্টি বছরের মুছে যাওয়া ত দূরের কথা, এতটুকুও ম্লান হয় নাই। আমাদের বাসার পিছনে একটা হোগলার বন ছিল। সে বনে বহু গোসাপ বাস করিত। এরা

সর্বদা নিঃসংকোচে পোষা কুকুর-বিড়ালের মতন সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। কি কারণে জানি না, গোসাপ মারা নিষিদ্ধ ছিল। একদিন আমার ছোট ভগিনী, তখনও ভাল করিয়া তার কথা ফুটে নাই, আমাদের শুইবার ঘরের মেঝেতে ঘুমাইতেছিল। মা তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া পাকশালে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, দু'টো বড় গোসাপ ঘুমন্ত শিশুর বিছানায় তাহার দুই পাশ বালিশের দু'ধারে চোখ বুঝিয়া পড়িয়া আছে। আমিও মার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিয়া এই দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। সাপ দুটো আমার ভগিনী অপেক্ষা অন্তত দেড়গুণ লম্বা ছিল। মা তো এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোন শব্দ করিলেন না। চীৎকার করা তো দূরের কথা, তিনি যে ঘরে ঢুকিয়াছেন বোধ হয় সে সাড়া গোসাপ দুটো পাইয়াছিল। তাহারা চোখ খুলিয়া মাকে দেখিয়া আস্তে আস্তে পিছনের দরজা দিয়ে বাহির হইয়া গেল। তখন মা কাঁপিতে কাঁপিতে সন্তানকে বুকে আকড়াইয়া সে স্থান হইতে ছুটিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। এই দৃশ্য যখনই মনে পড়িয়াছে, তখন মার স্নায়ু যে কত স্থির এবং শক্ত ছিল, ইহা ভাবিয়া অবাক হইয়াছি।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। শৈশব স্মৃতি গল্পে লেখক তাঁহার শৈশবের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন উহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ।

(ক) কোর্টের হাটের……মাতাইয়া তোলে।

(খ) এই দৃশ্য……অবাক হইয়াছি।

'শৈশব স্মৃতি' গল্পে লেখক তাঁর শৈশবের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

—কামিনী রায়

[**কবি-পরিচিতি ঃ** কামিনী রায় বরিশাল জেলার বাসণ্ডা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাঙলার মহিলা কবিগণের অগ্রগণ্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য]

ওহে দেব, ভেঙে দাও ভীতির শৃঙ্খল
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায় বিসর্জন।
স্বামিন্, নির্দেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,
তোমারি নির্দিষ্ট করি কাজ,—
ছোট হোক্, বড় হোক্, পরের নয়নে
পড়ুক বা না পড়ুক তাহে কেন লাজ ?
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার,
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যে টুকুর ভার।
ভুলে যাই আপনারে যশ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভয়ের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

॥ **প্রশ্নাবলী** ॥

১। 'কামনা' কবিতার সারমর্ম লিখ।

২। ব্যাখ্যা লিখ ঃ (ক) স্বামিন্, নির্দেশে……কেন লাজ ?
(খ) ভুলে যাই……তৃপ্ত কর দাসে।

৩। শব্দার্থ লিখ ঃ শৃঙ্খল, বিসর্জন, বিভব, অপবাদ, স্মরণ।

তরুণ

গুরুসদয় দত্ত

[**কবি-পরিচিতি ঃ** গুরুসদয় দত্ত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন আই. সি. এস্ ছিলেন। ১৯৩১ সালে ইনি ব্রতচারী-নৃত্য আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এই কবিতায় বাংলার তরুণ দলের মহৎ সংকল্পের কথা বলা হইয়াছে।]

বাংলা-মার দুর্নিবার আমরা তরুণ-দল।
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সঙ্কটে অটল॥

গঙ্গা-রাঢ়, পাল-রাজার বীর্য-গরিমা—
চণ্ডীদাস জয়দেবের ছন্দ-মহিমা—
ঢেউ তা'দের দেয় মোদের চিত্তে নব বল।

নিঃস্বতার দৈন্যভার করব উৎসাদন;
অজ্ঞতার অন্ধকার করব নির্বাসন;
এই যুগের উন্মেষের জ্বালব দীপ উজল।।

সংযমের পৌরুষের পালব প্রেরণা,
শ্রমযোগের উদ্‌যোগের সাধব সাধনা;
বাংলা-মার লাঞ্ছনার মুছব আঁখিজল,

আমরা তরুণ দল।।

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। তরুণ দলের সংকল্পগুলি তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। তরুণ দল কোথা হইতে প্রেরণা পাইতেছে?

৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: চণ্ডীদাস, জয়দেব, পালরাজগণ।

৪। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) অজ্ঞতার অন্ধকার করব নির্বাসন

এই যুগের উন্মেষের জ্বালব দীপ উজ্জ্বল ॥

শূন্যস্থানে যথাযথ শব্দ বসাও:

সংযমের — পাল্‌ব প্রেরণা,

শ্রম যোগের উদ্‌যোগের সাধব — ;

বাংলা-মার — মুছব আঁখি জল।

—দল।

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবিতাটিতে উল্লিখিত সংকল্পগুলির মূল লক্ষ্য আলোচনা কর।

কবিতাটিতে তরুণদলের সংকল্পের কথা বলা হয়েছে।

পরার্থে কামনা

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

[কবি-পরিচিতি ঃ ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। দেশের কাজে তিনি তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'দেশবন্ধু' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। দেশবন্ধু সুকবি ছিলেন। আলোচ্য কবিতায় দেশবন্ধুর মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব-সংসার—
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে,
হাসি-আবরণ টানি' দুঃখ ভুলে যাও,
জীবনের সরবস্ব—অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙি'—বিশ্বে ঢেলে দাও !
হায়, হায়, জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুমকলি—নয়ন-কিরণে,
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে,—কি ফল জীবনে ?

চাহিলে নিজের। শুধু, বিফল সাধনা ;
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

॥ সাধারণ প্রশ্ন ॥

১। কবিতাটির ভাবার্থ লিখ।

২। বিশদ ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন।

(খ) জীবনের সরবস্ব—বিশ্বে ঢেলে দাও।
বাসনার স্তর ভাঙ্গি—বিশ্বে ঢেলে দাও

(গ) চাহিলে নিজেরা শুধু, বিফল সাধনা।
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।

৩। অর্থ লিখ : প্রাঙ্গণ, সরবস্ব, অশ্রু, বিশ্ব, কুসুমকলি।

৪। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : রাবণের চিতা।

এই পৃথিবীতে একজনের জন্য
দুঃখ কষ্ট লাঘব হয় সব তবেই
জীবনের সার্থকতা, এই ভাবটি
কবিতাটিতে যুক্ত হয়েছে। মানুষের
প্রতি কবির গভীর ভালবাসার চিত্রটি
কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে।

সেকেন্দ্রা

—সৈয়দ এমদাদ আলী

[বিষয়-পরিচিতি ঃ আকবরের সমাধির নাম সেকেন্দ্রা। কবি এই কবিতার মাধ্যমে ভারত-সম্রাট আকবরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন।]

এইখানে মোগলের মুকুট-রতন
শয়ান শান্তির মাঝে, পথিক সুজন
নেহারিয়া এ সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির, হৃদয় গগনে
ভাসে তা'র কত ছবি কত পুণ্য কথা
কত বরষের হয়ে কত শত ব্যথা !

মনে পড়ে অতীতের দিল্লী-দরবার,
মোগলের শত হর্ম্য সুষমা-আগার।
মনে পড়ে এই পথে এমনি সময়ে
বীর যোদ্ধা অগণন উৎফুল্ল হৃদয়ে
চলে যেত অবিরাম ; আর আজি হায়,
ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লী ভয় পায় !

যে জন শয়ান হেথা অন্তিম-শয্যায়,
কত রাজ মহারাজ তাঁহার সভায়

কল-সম্ভাষণে কত কহিত কাহিনী,
কাঁপাইত কত বীর গর্জনে মেদিনী ;
কত কবি ঝঙ্কারিয়া সুমধুর তান
নিয়ত তুষিত কত মহাজন-প্রাণ
সেই সভা-মাঝে নিত্য ফায়জী, ফজল,
বীরবল, তোদর্মল, অমাত্য সকল
প্রকৃতি পুঞ্জের হিতে দিবসে নিশায়
সমদর্শী সম্রাটের সঙ্গে থাকি' হায়,
কত নীতি শুভঙ্করী করিত রচনা,
প্রজাহিতে নৃপহিতে করিয়া কামনা।
মোস্লেম-হিন্দুরে বাঁধি' প্রেমের বন্ধনে,
প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষেত্রে অভিন্ন পরাণে,
চেয়েছিল দেখিবারে সেই মহাজন,
সেকেন্দ্রা তাঁহার অস্থি করিছে ধারণ।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। সেকেন্দ্রা কবিতায় কবি কাহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন ? তাঁহার বিষয়ে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। বিশদ ব্যাখ্যা লিখ : (ক) মনে পড়ে……ঝিল্লী ভয় পায়।
(খ) কত কবি ঝঙ্কারিয়া সুমধুর তান
নিয়ত তুষিত কত মহাজন প্রাণ।
(গ) মোস্লেম-হিন্দুরে……করিছে ধারণ।

৩। অর্থ লিখ : ভক্তিপ্লুত, সম্ভ্রম, হর্ম্য, ঝিল্লী, কল-সম্ভাষণ, অস্থি।

কর্ম

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কবি-পরিচিতি : নদীয়া জেলায় জমসেরপুরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন বাগচী জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে কবিতা লিখিয়া ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। এই কবিতায় কর্মই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।]

শক্তি মায়ের ভৃত্য মোরা—নিত্য খাটি নিত্য খাই,
শক্তবাহু শক্ত চরণ, চিত্তে সাহস সর্বদাই।
ক্ষুদ্র হউক, তুচ্ছ হউক, সর্ব সরম শঙ্কাহীন—
কর্ম মোদের ধর্ম বলি কর্ম করি রাত্রি দিন।

চৌদ্দ পুরুষ নিঃস্ব মোদের—বিন্দু তাহে লজ্জা নাই,
কর্ম মোদের রক্ষা করে অর্ঘ্য সঁপি কর্মে তাই।
সাধ্য যেমন, শক্তি যেমন,—তেমনি অটল চেষ্টাতে
দুঃখে সুখে হাস্যমুখে কর্ম করি নিষ্ঠাতে।

কর্মে ক্ষুধার অন্ন যোগায়, কর্মে দেহে স্বাস্থ্য পাই,
দুর্ভাবনায় শান্তি আনে—নির্ভাবনায় নিদ্রা যাই।
তুচ্ছ পরচর্চা গ্লানি—মন্দ ভালো কোনটাকে—
নিন্দা হলে মুক্তি দিয়ে হাল্কা রাখে মনটাকে।

পৃথ্বীমাতার পুত্র মোরা, মৃত্তিকা তাঁর শয্যা তাই।
শষ্পে তৃণে বাসটি ছাওয়া, দীপ্তি হাওয়া ভগ্নী-ভাই।
তৃপ্ত তারি শস্যে জলে ক্ষুৎপিপাসা দুঃসহ
মুক্ত মাঠে মুক্ত করে বন্দি তারেই প্রত্যহ।

ক্ষুদ্র নহি, তুচ্ছ নহি—ব্যর্থ মোরা নই কভু
অর্থ মোদের দাস্য করে—অর্থ মোদের নয় প্রভু।
স্বর্ণ বল, রৌপ্য বল, বিত্তে করি জন্মদান,
চিত্ত তবু রিক্ত মোদের নিত্য রহে শক্তিমান্।

কীর্তি মোদের মৃত্তিকাতে প্রত্যহ রয় মুদ্রিত
শূন্য পরে নিত্য হেরে স্তোত্র মোদের উদ্গীত।
সিন্ধুবারি পণ্যবাহি ধন্য করে তৃপ্তিতে,
বহ্নি মোদের রুদ্রপ্রতাপ ব্যক্ত করে দীপ্তিতে।

বিশ্ব জুড়ি সৃষ্টি মোদের হস্ত মোদের বিশ্বময়,
কাণ্ড মোদের সর্বঘটে কোন্‌খানে তা দৃশ্য নয়?
বিশ্বনাথের যজ্ঞশালে কর্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম সে যে ধর্ম মোদের—কর্ম চাহি—কর্ম চাই।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। কর্ম কবিতার সারমর্ম লিখ।
২। নিম্নের পঙক্তিগুলির মর্মার্থ বুঝাইয়া লিখ :
(ক) ক্ষুদ্র হউক, তুচ্ছ হউক, সর্ব সরম শঙ্কাহীন
কর্ম মোদের ধর্ম বলি কর্ম করি রাত্রিদিন।
(খ) তুচ্ছ পরচর্চা গ্লানি মন্দ ভালো কোন্‌টাকে
নিন্দা হতে মুক্তি দিয়ে হাল্কা রাখে মনটাকে।
(গ) সিন্ধুবারি পণ্য বহি ধন্য করে তৃপ্তিতে,
বহ্নি মোদের রুদ্র প্রতাপ ব্যক্ত করি দীপ্তিতে
৩। শব্দার্থ লিখ : নিঃস্ব, নিষ্ঠা, গ্লানি, দাস্য, রিক্ত, মুদ্রিত।

রসাল স্বর্ণলতিকা

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[**কবি-পরিচিতি ঃ** যশোহর জেলার সাগরদাড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থাতে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'মাইকেল' উপাধি গ্রহণ করেন। 'মেঘনাদ-বধ', 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি কাব্য, 'কৃষ্ণকুমারী', 'শর্মিষ্ঠা' প্রভৃতি নাটক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী ইহার সাহিত্য প্রতিভার জলন্তদৃষ্টান্ত।]

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে ;—
"শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি ;
নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্র কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি সদৃশ আমি
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !

কালাগ্নির মত তপ্ত তপন, তাপন—
আমি কি লো ডরাই কখন ?

দূরে রাখি গাভীদলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজকাজ দরিদ্র পালন!
আমার প্রাসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন।
কেহ অন্ন রাধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ চরণে!
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন!
মধুমাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে!
তুমি কি তা জান না ললনে?
দেখ মোর ডাল-রাশি
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে!
ধন্য মোর জনম সংসারে
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুঃখী;
নিন্দাবিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখি!"

নীরবিলা তরুরাজ, উড়িলা গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘগম্ভীর স্বননে,
আইলেন প্রভঞ্জন
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব সমরে।

আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকূল ঝড়ে

ঐরাবত পিঠে চড়ি

রাগে দাঁত কড়মড়ি,

ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে !

উরুভাঙ্গি কুরুরাজে বধিল যেমতি

ভীম যোধপতি ;

মহাঘাতে মড়মড়ি

রসাল ভূতলে পড়ি

হায় বায়ুবলে

হারাইলা আয়ুসহ দর্প বনস্থলে !

উর্ধ্বশির যদি তুমি কুলমান ধনে ;

করিও না ঘৃণা তবু নীচ শির জনে ।

এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে ।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। এই কবিতার দ্বারা কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) শুন, ধনি, রাজকাজ দরিদ্র পালন ।

(খ) কালাগ্নির মত তপ্ত তপন তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন ?

(গ) নীরবিলা তরুরাজ·········কৌরব সমরে ।

(ঘ) উরু ভাঙ্গি······বনস্থলে ।

(ঙ) উর্ধ্বশির···জনে ।

৩। অর্থ লিখ : ক্ষুদ্র কায়া, হিমাদ্রি-সদৃশ, কালাগ্নি, অনুক্ষণ, বিধুমুখী, প্রভঞ্জন ।

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর ।

২। রসাল ও স্বর্ণলতিকার মধ্যে কথোপকথন তোমরা আলোচনা কর ।

দুর্যোগের অতিথি

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[**কবি-পরিচিতি ঃ** সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যাদুকরের মত তিনি ছন্দের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেন। বাস্তবিকই তিনি বাংলা-ছন্দকে বৈচিত্র্য এবং নূতন নূতন ঝঙ্কারে অজস্র ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি একটি পতঙ্গের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর ব্যথা অনুভব করিয়াছেন।]

সেদিন হঠাৎ বর্ষা পেয়ে,
কামিনী ফুল ফুটল বনে ;
আমি তাহার একটি গুচ্ছ
তুলে ছিলাম পুলক মনে।

ঘরে এসেই দোয়াত হ'তে
লুকিয়ে ফেলে দিলাম কালি ;
দোয়াতের সে ফুলদানিতে
ফুলটি রেখে দেখ্‌ছি খালি।

জোর বাতাসে, হঠাৎ ঘরে,
ঢুকল সে এক প্রজাপতি ;
রইল রে সে সারাটি দিন,
একলা ঘরের হয়ে সাথী।

অতিথ্ হ'ল আমার ঘরে,
প্রজাপতি আপন হতেই ;
ঝড় বাদলে, ছাড়্‌তে তা'রে,
পারব না ত' কোন মতেই।

কবাট দিলাম বন্ধ ক'রে
জানলা দিয়ে দিলাম তাই,
সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে,
ভাবছি বসে কত কথাই।

হঠাৎ উড়ে, আলোয় প'ড়ে
প্রজাপতির জীবন গেল ;
হায়, অতিথি ! নয়ন জলে,
নয়ন আমার ভ'রে এল।

দুর্দিনের সেই অতিথিরে,
হায়, সুদিনের সুপ্রভাতে,—
আমার স্নেহ—পাথেয় দিয়ে
পেলাম নারে আর পাঠাতে।

আবার আমি তেমনি ক'রে
অনল-দগ্ধ দেহটি তা'র,
রেখে দিলাম ফুলের' পরে
এঁকে নিলাম বুকে আমার।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

দুর্যোগের অতিথি কে? কবি ইহাকে কি ভাবে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন ? কি ভাবেই বা বিদায় দিয়াছিলেন ?

২। 'রইল রে সে সারাটি দিন,
একলা ঘরের হ'য়ে সাথী,—এখানে সারাদিন কে কাঁর সাথী হইয়াছিল ?

২। মর্মার্থ বুঝাইয়া লিখ : দুর্দিনের সেই······আর পাঠাতে।

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
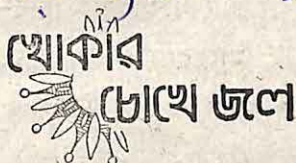
খোকার চোখে জল

—কৃষ্ণদয়াল বসু

খোকার চোখে জল,—
অপরিজিতার পাপড়ি যেন
শিশির ছলোছল !
চপল কালো দুটি আঁখি
নীল গগনের ও নীল পাখী—
ডুব দিয়ে আজ এলো নাকি
নীল সায়রের তল ?

যুগল ভ্রমর এলো ভিজে
কোন্ সরসীর সরসিজে ?
পারি না হায় বুঝতে নিজে—
বুঝাই কি যে বল ?

খোকার চোখে জল,—
শরৎ আকাশ মলিন ক'রে
নামলো রে বাদল !

জলভরা ঐ কালো মেঘে
উঠবে খুসির আলো জেগে
হাল্কা হাসির হাওয়া লেগে
করবে ঝলোমল !

কান্না হাসির সেই মাধুরী—
আলোছায়া লুকোচুরি—
মায়ের মনের মায়াপুরী
করছে উজ্জ্বল।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। খোকার চোখে জল কবিতায় কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) যুগল ভ্রমর এলো ভিজে
কোন্ সরসীর সরসিজে ?
পারি না হায়, বুঝতে নিজে
বুঝাই কি যে বল ?

(খ) কান্না হাসির সেই মাধুরী
আলোছায়ার লুকোচুরি
মায়ের মনের মায়াপুরী
করেছে উজ্জ্বল।

৩। শব্দার্থ লিখ : সায়র, সরসী, সরসিজ, মায়াপুরী, উজ্জ্বল।

বিদ্রোহী

—কাজী নজরুল ইসলাম

[**কবি-পরিচিতি ঃ** বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সহজাত কবি প্রতিভা ছিল। প্রথম যৌবনে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখিয়া তিনি বিদ্রোহী কবি নামেই পরিচিত হন। আলোচ্য কবিতাটি বিদ্রোহী কবিতার অংশমাত্র। 'অগ্নিবীণা', 'ছায়ানট', 'বিষের বাঁশি' ইত্যাদি ইহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। সংগীত রচনাতেও ইহার কৃতিত্ব অসাধারণ। নিজেও সুগায়ক ছিলেন। কবি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পরলোক গমন করিয়াছেন।]

বল বীর
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
বল বীর—
আমি চির উন্নত শির।......

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!

আমি হল বলরাম স্কন্ধে,
আমি উপড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে
নব সৃষ্টির মহানন্দে,
মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির
বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিবো পদচিহ্ন ?
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি চির বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির ।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। বিদ্রোহী কবিতায় কবির মনের কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।

(খ) মহা-বিদ্রোহী……আমি সেই দিন হবে শান্ত।

(গ) আমি বিদ্রোহী ভৃগু……উন্নত শির।

৩। অর্থ লিখ : হিমাদ্রি, দ্যুলোক, আরশ, পদচিহ্ন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[**কবি-পরিচিতি ঃ** কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে অন্যতম। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর বংশে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আলোচ্য শরৎ কবিতায় বাংলাদেশের শরৎ কালের রূপ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।]

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে !
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎ কালের প্রভাতে।
জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।

অবসর আর নাহিকো তোমার—
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম পথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরণী।
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।

স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বার তলে
দিশি দিশি হতে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী।
বহিছে প্রথম শিশির সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।

দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন
হাসি ভরা মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।

ছুটিছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে।

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া—
ভাণ্ডার দ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়—
আয় তোরা সবে জুটিয়া।

ভাণ্ডার দ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া
মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য
গন্ধে ভরেছে অবনী
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

পরেছ কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম ভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।

আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। বাংলা দেশের শরৎকালের রূপ বর্ণনা কর।

২। 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে'।

—নবান্ন উৎসব কাহাকে বলে?

৩। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) স্থলে জলে……তরণী।

(খ) দিকে দিকে……লয় কুড়ায়ে।

(গ) মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য……অবনী

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

১। নবান্ন উৎসব সম্বন্ধে নিজেরা আলোচনা কর।

কবিতাটিতে বাংলাদেশের শরৎকালের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

জীবন ভিক্ষা

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

[**কবি-পরিচিতি ঃ** নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্র শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম। 'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা' ইত্যাদি ইহার রচিত কাব্য গ্রন্থ।]

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো দুলালে আগলি বক্ষে
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস সরিৎ দর-বিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন, চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ শ্যেনের পক্ষে।
স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন পরসাদ-মধুরসে অভিষিক্ত ?
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ, শুষ্ক অধর কমল-পর্ণ,
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযুষ-বিন্দু-রিক্ত ?
কোথা সে মাধুরী আধ আধ বোলে ? কুন্দ-বৃন্ত ছিন্ন,
দন্ত রুচিতে কই সে কান্তি পুণ্য হাসির চিহ্ন ?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে ননীর পুতুলি জাগিবে হরষে
কোন্ পাষাণের বিষ-বাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন ?
অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ দুরগম পথ ক্ষুরধার সম সূক্ষ্ম
দিয়ে তপোবল মহানির্বাণ কুমারে আমার কর প্রাণদান।"
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে আলুথালু কেশ রুক্ষ !

কহেন বুদ্ধ—"তনয় তোমার নীরব সমাধি-মগ্ন
বরণ করেছে চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন।
থাকে যদি কোথা অশোক-নিলয় ভিখ্ মাগি আনি সর্ষপচয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ-মৃণাল ভগ্ন!"
বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা,
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে,—"শিখাইলে শেষ শিক্ষা।
জীয়াতে চাহিনা তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার
হর জগতের বিরহ আঁধার, দাও গো, অমৃত-দীক্ষা!"

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। যে বিষয়বস্তু অবলম্বনে কবি জীবন ভিক্ষা কবিতা রচনা করিয়াছেন উহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।
২। জীবন ভিক্ষা কবিতার সারমর্ম কি?
৩। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) শত চুম্বনে মেলে না নয়ন······শ্যেনের পক্ষে।
(খ) অবনীর এই পদ্ম······কর প্রাণ দান।
(গ) তনয় তোমার······পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।
(ঘ) জীয়াতে চাহি না······অমৃত দীক্ষা।
৪। শব্দার্থ লিখ: দেউল, স্তন-ক্ষীরধার, রসনা, ইন্দু, কুন্দ-বৃন্ত, অবনী, ত্রিতাপ-দুঃখ, নীরব সমাধি মগ্ন; অশোক-নিলয়।

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।
(ক) স্ত্রীলোকটি বুদ্ধদেবের নিকট কেন গিয়াছিল?
(খ) বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকটিকে কি আনিতে বলিয়াছিলেন?
(গ) স্ত্রীলোকটি পরে কি করিয়াছিল?

হঠাৎ যদি

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটা কয়েক আইন জারি
দু'এক জনার খুব ক'সে দিই সাজা।
মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব
বৃষ্টি ফোটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজ্‌গুলো সব স্ফূর্তি ক'রে বাজা
আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে,
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা।
হাওয়ায় বলি, হল্লা ক'রে চল
তারার বাতি নিভিয়ে দলে দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের পুরীর সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধরে খুব কষে দিই সাজা।

আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে,
কেউ করে দেয় আজকে রাতের রাজা।
ওলট পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা,
মনের মত কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব করে নিই ঘটা।
সত্য তা সে যতই বড় হোক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোন ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। কবিকে হঠাৎ কেহ একরাত্রির জন্য রাজা করিয়া দিলে কি ভাবে তিনি পৃথিবী ওলট পালট করিয়া দিতেন তাহার একটি বর্ণনা দাও।

২। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) হাওয়ায় বলি হল্লা করে চল
তারার বাতি নিভিয়ে দলে দলে,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।

(খ) সত্য তা সে যতই বড় হ'ক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোন ছেলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

———

রানার

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

[কবি-পরিচিতি : কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব প্রতিভা। জন্ম ১৯২৬, মৃত্যু ১৯৪৭। অতি অল্পবয়সে কবিরূপে আবির্ভূত হইয়া নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে যৌবনের প্রারম্ভেই ইহলোক ত্যাগ করেন। সুকান্তের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাঁহার কাব্যে কবিতা ও জীবন একই সঙ্গে মিশিয়াছে। সুকান্ত বঞ্চিত জীবনের কবি বলিয়া খ্যাত।]

রানার ছুটেছে, তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে।
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে—
রানার চলেছে, রানার !
চলে রাত্রির পথে কোনো ইশারা মানে না মানার
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার।
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রানার ! রানার !
জানা-অজানার বোঝা আজ তাঁর কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে,
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয়-হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
কত গ্রাম কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্ঠন্ জোনাকিরা দেয় আলো ;
মাভৈঃ রানার ! এখনো জমেনি জমাট রাতের কালো

রানার ! রানার !
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হ'য়ে সূর্য উঠবে কবে ?
ঘরেতে অভাব ; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু টাকাকে যাবে না ছোঁয়া !
রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয় তার চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে।
কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে স্মৃতিতে, কত না দুঃখে শোকে।
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনদিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানিবে পথের তৃণ।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

১। রানারের জীবনের স্বপ্ন কি ?
২। রানারের কি কাজ করিতে হয় ?
৩। 'কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার'—কি সে নতুন খবর ?
৪। মাভৈঃ রানার। এখনো জমেনি জমাট রাতের কালো'—কবি একথা কেন বলিতেছেন ?

॥ মৌখিক আলোচনা ॥

১। মুখে মুখে উত্তর দাও :
(ক) রানারের পোশাক কেমন ?
(খ) রানারের হাতে কি কি থাকে ?

———

আবার আসিব ফিরে

—জীবনানন্দ দাশ

[**কবি-পরিচিতি ঃ** জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তিকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ভাব ও ভঙ্গির দিক দিয়া তিনি এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। 'রূপসী বাংলা' তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। এই কবিতাটি 'রূপসী বাংলা' কাব্য হইতে লওয়া হইয়াছে।]

আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়ত মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙ্গায় ;
হয়তো দেখিব চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে ;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াইতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে,
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পাল
ডিঙা বায় ,—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক , আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

॥ প্রশ্নাবলী

১। কবি বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছেন কেন ? তিনি কি কি বেশে ফিরিয়া আসিবেন লিখ।

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। ব্যাখ্যা লিখঃ

(ক) আবার আসিব আমি…করুণ ডাঙ্গায়।

(খ) রূপসার ঘোলা জলে……ইহাদের ভিড়ে।

আলোচ্য কবিতাটিতে রূপসী বাংলার ছবিটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।